আলোকলগন

১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮
ডিসেম্বর, ১৯৬১
প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
১, কলেজ রো
কলকাতা-৯
মুদ্রক
ত্বিষাম্পতি দত্ত
সাক্ষর মুদ্রণী
১ কলেজ রো,
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ-শিল্পী
অরুণ বণিক
চার টাকা

চলচ্চিত্ররসিক শ্রীঅসিত চৌধুরী

স্নেহভাজনেষু

এই লেখকের অন্য উপন্যাস

বাসর

তপতীকন্যা

আঁখি-বিহঙ্গ

সুধাপারাবার

নকল রাজা নকল রাণী

অনেক দিন আগে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'আরও আলো' নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছিলাম। অনেক দিন পরে উপন্যাসটির সংস্কার করতে বসে ক্রমে ক্রমে তার অনেক কিছুরই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হল। বইটির নতুন নামকরণ হল 'আলোক লগন।'

সমীর !

বিধবা দিদির কোলে মাথা রেখেই সমীর উত্তর দিল, কি দিদি ?

কেঁদে আর কি হবে ভাই, ভগবান যে আমাদের দুঃখকষ্ট সইতেই পাঠিয়েছেন এ জগতে, নইলে—

মাথা তুলে সমীর বলল, না দিদি, ভগবানের এ অন্যায় আমি মাথা পেতে নিতে পারব না।

ভাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে অশ্রু বলল, ছিঃ সমীর, শত দুঃখকষ্টেও ভগবানে কখনও বিশ্বাস হারিও না।

কিন্তু দিদি, যে এক অজ্ঞাত ভগবান তার অসীম শক্তির গর্বে দুটি অসহায় ভাইবোনের মাথায় এমন করে অভিশাপের বজ্র হানতে পারে, তার ওপর মনের নির্ভরতা যে আপনি নষ্ট হয়ে যায়।

এর পরে অশ্রুর মুখে কোন কথা বের হয় না।

ও ভাবে : সত্যি ত, এই কি ভগবানের সুবিচার ! ওর অনভিজ্ঞ জীবনের মাঝে ছোট্ট ভাইটিকে ফেলে মাত্র দু'মাসের আগপাছে বাবা ও মা পরপারের পথ ধরলেন। সংসারে আশ্রয়ের মধ্যে রইল বৃদ্ধ দাদামশায় ও মামা-মামীর মস্ত সংসার।

অশ্রুর সজল মনের পটে অতীতের অনেক ছবি ভেসে ওঠে।

ওর বাবা ছিলেন স্কুলের মাষ্টার। শিক্ষা ছিল তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ। মায়ের অনেক অমতেও মেয়েকে তিনি কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

অশ্রুর বয়স তখন মাত্র উনিশ। সমীর নয় বছরের ছেলে, স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র।

তেমনি এক সন্ধ্যায় বাবার পড়ার ঘরে বাতি দিতে গিয়ে অশ্রু দেখল তিনি একখানি মোটা বইয়ে মুখ রেখে উপুড় হয়ে আছেন।

ও ডাকল, বাবা, সন্ধ্যা যে হয়ে গেছে, একটু বেড়াতেও আজ গেলে না?

বাবা জবাব দিলেন, মাথাটা সোজা করতে পারছি না রে, ভিতরে যেন ভূমিকম্প চলেছে। আমায় একটু নিয়ে চল্ তো বিছানায়।

বিছানায় শুয়ে সেই রাতেই ওর বাবা জ্ঞান হারালেন। কয়েক দিন ছিলেন, তেমনি ভাবেই, তারপর বুজলেন চোখ।

ডাক্তার বলল, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমেই এই হয়েছে।

তারপর বৃদ্ধ দাদামশায়ের স্নেহাতুর বুকের ছায়াতলে দুটি ভাই-বোন একটু শান্তির নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই তিনিও এক জলভরা সন্ধ্যায় চোখ বুজলেন। ওদের জীবনের সামনে নেমে এল ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার।

দুঃখ-লাঞ্ছনার মরুভূমিতে কত শত জীবন কেটে যাচ্ছে, ওদেরও যাচ্ছিল। মামা-মামীর সুনজরে ওরা পড়তে পারে নি, সে দোষ ওদেরই স্বাধীন মনের। তবু দুটি খাবার ওদের আজও জুটছে তাঁদেরই কৃপায়, ভাইবোন এজন্য চিরকৃতজ্ঞ।

আরও কয়েকটি অশ্রুসিক্ত রেখা না টানলে আমাদের জীবন-কথার পট-ভূমি সম্পূর্ণ হবে না।

নিতান্তই গতানুগতিকভাবে মামার চেষ্টায় এক বুড়ো কাশের রোগীর সঙ্গে অশ্রুর একদিন বিয়ে হয়ে গেল।

বুক ফাটা দুঃখকে বুকের তলে চেপে সকলের অগোচরে সেদিন অনেক চোখের জল ফেলেছিল অশ্রু।

অশ্রুসিক্ত দুটো চোখের সামনে সেদিন বারবার ভেসে এসেছিল

আর একখানি তরুণ মুখের ছবি। ব্যথাম্লান দুটি কাতর চোখের সজল দৃষ্টি।

আকাশে হাত তুলে সেদিন কতবার ও বলেছিল, ভগবান, মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও!

আকাশের অজস্র তারা ধীরে মেঘের তলে ডুবে গেল, কিন্তু ভগবানের সাড়া মিলল না।

বছর না যেতেই অশ্রু আবার ফিরে এল মামার পায়ের তলে, শাঁখা-সিন্দুর হারিয়ে।

মন ওর তখন অনেক হাল্‌কা, ছোট ভাইটিকে বুকে জড়িয়ে তাকাল সামনে: অসীম প্রান্তর অবেলার স্বল্প আলোয় ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে দিগন্তে মিশে গেল।

সকল মানুষেরই মধ্যে এমন একটা ঘুমান শক্তি থাকে, যা একদিন সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবেই। সমীরের বুকের তলে সে গোপন বহ্নিশিখা এতদিন ছাই-চাপা ছিল। কিন্তু জীবনাসনে তারুণ্যের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সে শিখা ক্রমেই আত্মপ্রকাশ চাইছে জোর গলায়। সমীরের তরুণ স্বপ্নচারী মন মামাবাড়ির অবহেলার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বিরুদ্ধে ক্রমে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ওর বুকের তলে প্রশ্ন জাগল—সবারই মত সেও ত মানুষ, সবার বুকের তলে যে রক্ত নেচে চলে, তারও বুকে সেই নাচন, তবে সকলের সঙ্গে সমান পথে পা ফেলে চলার দাবী হতে সে কেন বঞ্চিত হবে?

সংসারের খবর সমীর বড় একটা রাখে না, ওর সে-সব ভাল লাগে না। তবু ছোটবড় অনেক কাজই ওকে করতে হয়। মামা-মামীর ফরমাস আর ভায়েদের লাঞ্ছনার বোঝা বইতে ওর তরুণ মন সময় সময় বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে।

সমীর তখন ভাবে: সব ছেড়ে চলে যাবে দূরে, নীলাকাশ যেখানে লুটিয়ে পড়েছে সবুজ বনানীর বুকে।

আনন্দে মন ওর গান গেয়ে ওঠে। কিন্তু তখনি মনে পড়ে অসহায় দিদির কথা। সব কল্পনা ওর ভেঙে যায়।

যতদিন স্কুল ছিল ততদিন তবু দিনগুলো ভালই কাটত। কিন্তু স্কুল ফাইনাল পাশের পর হতে এই অলস নিষ্কর্ম পরাশ্রিত জীবন ওর অসহ্য হয়ে উঠল।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে ও গ্রাম ছেড়ে মাঠে চলে যায়। সেখানে বসে বসে চাষাদের লাঙল চালান দেখে, দেখে তাদের দুঃখ-দীনতার ছবি, প্রাণে বেঁচে থাকবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম। দেখে আর ভাবে : এই হাড়ভাঙা খাটুনি ওরা খাটে রোদ-জল-ঝড়ে, অথচ পেটের দানাও ওদের জোটে না।

একদিন সন্ধ্যায় সমীর দিদিকে শুধাল, আচ্ছা দিদি, সংসারে সবচেয়ে কষ্ট পায় কারা বেশী ?

অশ্রু বলল, যারা গরীব, সহায়হীন তারাই।

কারণ বোধ হয়, সংসারে সবচেয়ে বেশী খাটে ওরাই। কিন্তু কেন এই অবিচার ?

অশ্রু হেসে শুধাল, কি অবিচার রে সমীর ?

সমীর শক্ত গলায় উত্তর দিল, এই যে সব চেয়ে বেশী পরিশ্রম করেও এরাই পায় সবচেয়ে অল্প। বুকের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত জল করেও এদের জোটে না পেটভরে খাবার, গায়ের কাপড়। অথচ সমাজের ওপর শুধু সর্দারী করে করেই যারা দিন কাটায় তারা টাকার ওপর বসে পা ঝোলায়।

অশ্রু ভীতস্বরে বলল, এ যে সমাজের নিয়ম সমীর।

বিদ্রোহী সমীর শক্ত গলায় জবাব দিল, তাহলেও এ অন্যায় নিয়ম। শক্তিমান যাতে দুর্বলের রক্ত খেয়ে বড় হতে না পারে, সেই জন্যই ত সমাজের সৃষ্টি। যে সমাজের তলে সহস্র কৃষকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে মানুষ স্বচ্ছন্দে বুক ফুলিয়ে সভ্যতার গর্ব করে, সে মিথ্যা সমাজ অতি ক্ষণস্থায়ী।

অশ্রু বলল ওর উৎসাহে বাধা দিয়ে, তাহোক, ওসব ভেবে আমাদের কি দরকার ?

আজ যে ভাববার দিন আমাদের এসেছে। তুমি হয় ত দেখনি দিদি, দুমুঠো অন্নের জন্য সহস্র মানুষের কী সে চেষ্টা। বুকের প্রত্যেকখানা হাড় কাতরে খাবার চাইছে, মুখের ওপর দুশ্চিন্তার কালোছায়া, শিরদাঁড় বেঁকে গেছে অনেক অভাবের ঝড়ে—

অশ্রুর এ সব অজানা নয়, তবু ও বলল, কিন্তু তাতে আমরা কি করতে পারি ?

সমীর উত্তর দিল, এই আত্মবিশ্বাসের অভাবেই ওদের আজ এই পতন। এর প্রতিকার আমি করব।

শঙ্কিত অশ্রু বলল, সমাজের বিরুদ্ধে তুই কি বিদ্রোহ করবি ?

সহজ গলায় সমীর জবাব দিল, সে ভয় তুমি কর না দিদি। বিদ্রোহ যারা করবে তারা আজও নিজেদের চেনে নি, তুমি আমি কি করতে পারি ? আমি শুধু এদের প্রাণে আত্মবিশ্বাস জাগাতে চাই। শুধু দেখাতে চাই যে, একটা জীবনের আকুল চেষ্টায় মানুষ সব কিছু করতে পারে জগতে।

অশ্রু এবার উঠল হেসে, তুই কি করতে চাস সমীর!

আহত কণ্ঠে জবাব এল, তুমি হেস না দিদি, এমন করে পথের ধূলি হয়ে মানুষের পায়ের তলে আমি আর পড়ে থাকতে পারব না। যেমন করেই হোক আমাকে উঠতেই হবে, মানুষের জয়যাত্রারথে আমারও অধিকার আছে।

অশ্রু বলল, অধিকার ত সবারই আছে। কিন্তু চলার সুযোগ-সুবিধা সকলেরই হয় না জগতে, সকলে ত সমান পাথেয় নিয়ে সংসারে আসে না।

তাই বলে কি মানুষ গোড়া থেকেই জড় হয়ে বসে থাকবে ?

তা আমি বলছি নে সমীর। চলার পথে পা বাড়াতে হবে সবারই। উপযুক্ত পাথেয় যার আছে, জয়যাত্রায় সার্থকতার স্বাদ

সে পাবে। আর ব্যর্থতা নিয়েই যে নেমেছে ধরার ধূলিতে, পথেই সে পড়ে থাকবে।

উৎসাহে সমীরের চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সত্যি দিদি, একথাটা আমিও অনেকদিন ভেবেছি। এগিয়ে যাবার জন্যই মানুষ এসেছে। সে এসেছে বড় হবার একটা সহজ দাবী নিয়ে। তবে কেন সে ধূলির তলে ধূলি হয়েই থাকবে চিরকাল?

দিদির কোলে মাথা রেখে সমীর আকাশের দিকে চোখ রাখল।

ওর চুলের ভিতর হাত বুলাতে বুলাতে অশ্রু ডাকল, সমীর!

কি দিদি?

তোকে একটা কথা বলব, সত্যি উত্তর দিবি ত?

মিথ্যা কথা তো কোনদিন বলি নি দিদি।

সে আমি জানি ভাই, তবু আমার কাছে কোন কথা গোপন রাখবি না ত?

সংসারে আমার আর কে আছে দিদি—

একটু থেমে অশ্রু বলল, আমাকে ছেড়ে তুই কোথাও যাবি না ত সমীর?

সমীর উত্তর দিল, এমন কথা দিতে পারি নে দিদি। এই ছোট্ট পল্লীর বন্ধ ঘরে ত আমার এ চঞ্চল জীবনকে আটকে রাখতে পারব না চিরদিন। দুঃখ কর না দিদি, প্রাণে আমার কিসের যেন একটা ক্ষুধা জেগেছে। বঞ্চিত জীবনে পাওয়ার আকুল আকাঙ্খা জন্মেছে। যদি কখনও এ ক্ষুধার টান আমাকে এ সঙ্কীর্ণতার বাইরে নিয়ে যেতে চায়, তখন ত সে ডাককে আমি অস্বীকার করতে পারব না।

ব্যথাভরা গলায় অশ্রু বলল, আমায় ছেড়ে তাহলে তুই যাবি।

সমীর জবাব দিল, হ্যাঁ দিদি, যাব। কিন্তু যেখানেই যাই, তোমার পা দুখানি আমার বুকে চিরদিনই আঁকা থাকবে।

সমীর অশ্রুর পায়ের তলে মাথা রাখল।

ওর মাথায় হাত দিয়ে অশ্রু একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

দুই

আঁধার তখনও ভাল করে নামে নি মাঠের পরে।

দু-একটি তারা উঠেছে আকাশে।

চাষীরা বাড়ি ফিরছে একে একে।

রাখাল ছেলেরা মাঠের পথে গান গেয়ে চলেছে।

চারদিকেই বিদায়ের তন্দ্রাতুর আরতি।

কি যেন ভাবতে ভাবতে সমীর ফিরছিল মাঠ থেকে। ত্রস্তপদ-শব্দে চিন্তায় পড়ল বাধা। চোখ তুলে দেখল একটা ছেলে এই দিকেই আসছে।

ওকে দেখেই ছেলেটি ডুকরে কেঁদে উঠল, সমীরদা।

কি হয়েছে রে রাখাল? কাঁদছিস কেন?

সমীরদা, বাবার অসুখ, কিন্তু পথ্যি দেবার পয়সা নেই। তাই চারটে ধান নিয়ে যাচ্ছিলাম বাজারে বেচতে। পথে ও পাড়ার মধু বোস আমায় দেখে থলেশুদ্ধ ধান কেড়ে নিয়েছে।

সমীর জিজ্ঞাসা করল, কেন নিল, কিছু বলেছে?

রাখাল জবাব দিল, হ্যাঁ সমীরদা বলল—চার বছরের খাজনা বাকী পড়েছে সে খেয়াল নেই, আবার লুকিয়ে ক্ষেতের ধান বেচা হচ্ছে। সব ধান এমনি বেচে ফেললে আমার খাজনা দিবি কোথা থেকে রে? আমি কত করে বললাম সমীরদা, কিছুতেই ফিরিয়ে দিলে না।

রাখাল কাঁদতে লাগলো।

একটু পরে সমীর বলল, চল্ ত সেখানে।

মধু বোসের বাড়ী এসে সমীর বলল, দেখ খুড়ো বেচারা গরীব মানুষ, তোমাদের খেয়েই ত মানুষ। দাও ওর ধান ক'টি ফিরিয়ে।

মধু গর্বে বলল, ও সব হবে না বাপু! বলি, ফিরিয়ে দিলে আমার যে ক্ষতি হবে, সেটা কে দেবে?

সমীর নরম হয়ে বলল, তোমার ত ভরা গোলা আছেই খুড়ো, না হয় মনে কর একথলে ধান চুরিই গেছে। কিন্তু ভেবে দেখ ওই ক'টি ধানের জন্য বেচারা পথ্যি অভাবে মারা পড়বে।

মধু চটে উঠল, আরে যাও যাও, মুখে অমন বলতে অনেকেই পারে। মামার ঘাড় ভেঙে খাও, তাই অমন লম্বা লম্বা কথা। থাক্‌ত নিজের দু'পয়সা, দেখা যেত কে কত বড় দাতা!

সমীর তবু বলল, দানধ্যানের কথা ত নয় খুড়ো, গরীব মানুষ তোমারই খেয়ে বেঁচে আছে, তাই বলছি। আর আমার যখন কিছুই নেই এ সংসারে, তখন আর থাক্‌লে কি হত তা বলে লাভ কি?

বাড়ীর সামনের আঁধার পথ দিয়ে কে যেন যাচ্ছিল। সেদিকে চেয়েই মধু বলল, ও যতই বক, একটি ধানও ফিরে পাবে না।

সমীরের কণ্ঠস্বর এবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল!

কিন্তু ফিরিয়ে তোমাকে দিতেই হবে। গরীবের মুখের গ্রাস তুমি এমন করে কেড়ে গোলা ভরতে পারবে না।

মধু ব্যঙ্গ করে বলল, কেন, গায়ের জোর না কি?

যদি দরকার হয়, তবে তাই।

কী—এত বড় কথা? বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।

সহজভাবে সমীর জবাব দিল, এই ত যাচ্ছি খুড়ো। রাখাল, তোর ধান নিয়ে চল্।

ধানের থলে বারান্দাতেই ছিল। রাখাল এক পা এগোতেই তাকে ধাক্কা দিয়ে মধু বলল, খবরদার বলছি—

সমীর আর সইতে পারল না। নিজ হাতে ধানের থলেটি তুলে রাখালের হাতে দিয়ে বলল, নিয়ে যা তোর ধান। আর এই পয়সা নিয়ে যা, তোব বাবার পথ্যি কিনে দিস্! আর খুড়ো, মানুষ ত তোমরা নও, তাই পশু-ব্যবহার ছাড়া তোমাদের মন পাওয়া যায় না।

রাখাল ধান ও পয়সা নিয়ে কম্পিত পায়ে আঁধারে মিশে গেল। নিরুপায় ক্রোধে মধু সেদিকে চেয়ে রইল।

সমীর বলল তীব্রকণ্ঠে, খুড়ো, যাদের রক্ত-জলকরা পরিশ্রমে শস্য জন্মে তাদের অনাহারী রেখে নিজেদের গোলা ভরবার চেষ্টা কর না। তারাও ত মানুষ। জেনো একদিন তাদের এ ঘুম ভাঙবে, সেদিনের কথা ভেবে কাজ করো।

সমীর হন্ হন্ করে মাঠের অন্ধকারে মিশে গেল।

মধুর মনের কুরুরাজ্যে দুশ্চিন্তা-শকুনি পাশা চালতে লাগল।

খোলা মাঠের মাঝে এসে সমীর থমকে দাঁড়াল।

সামনে দূরপ্রসারিত ঘন আঁধার। মাথার ওপর তারায় ঘেরা অসীম আকাশ।

এ মহাবিস্তারের মাঝে এসে সমীর যেন ভয় পেল। ফিরে তাকাল পিছনের আঁধার-ঢাকা স্তব্ধ গ্রামের দিকে।

মনে পড়ল, দাদামশায়ের হাত ধরে যেদিন প্রথম এসেছিল এখানে। পল্লীর ঘরে ঘরে তখন সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। দাওয়ায় বসে ছোট ছেলেরা উড়ন্ত পাখির সংখ্যা নির্ণয় করছে—আট, পনের, সাতাশ। একটু বড়রা খেলছে লুকোচুরি। দূর হতে ভেসে আসছে গাভীর ডাক ও কৃষকের গান। মন্দিরে বাজছে কাঁসর-ঘণ্টা, ধ্বনি উঠছে হরিবোল।

তারপর অনেক সন্ধ্যা ও উষা ওর জীবন-মাটিতে এসে চলে গেছে। দাদামশায়ের মৃত্যু-দিনটি ও ভুলবে না কোনদিন।

দিদির বিয়ে হল। বিয়ের সমস্ত আনন্দ উৎসাহ ওর এক মুহূর্তে ব্যাথার জলে নিভে গেল বরের চেহারা দেখে।

তারপর স্কুলের শেষদিন। মাষ্টার মশাইরা একে একে আশীর্বাদ করলেন। দিদিকে প্রণাম করে আশিস পেল, বাবার সুনাম বজায় রাখিস ভাই। গাড়ী চড়ে দল বেঁধে গেল ছোট্ট শহরে পরীক্ষা

দিতে। সেখানকার অনেক কিছুই ওর মনকে টেনেছিল। সব চেয়ে বেশী স্বপ্নাতুর করেছিল ওকে কলেজের লাল দালান।

কিন্তু সে স্বপ্ন-পতাকা আজ বাস্তবের ঝড়ের আঘাতে ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কোথায়!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সমীর সেখানে বসল। একবার ভাবল ফিরে যাবে।

কিন্তু কোথায় যাবে? সেই অভাবের আর্ত্তনাদ, বঞ্চনার হাহাকার, গরীবের মুখের গ্রাস কেড়ে ধনীর বিলাস-আনন্দ, তার মাঝে ফিরে যাওয়া ওর স্বপ্ন-পাগল মনের পক্ষে আজ অসম্ভব!

ও আজ পা বাড়াবেই অজানা সামনে। বিশ্বের দরবারে নিজের স্থান ও করে নেবেই।

শরীরটাকে একটা ঝাঁকি দিয়ে সমীর উঠে দাঁড়াল অতিচিন্তার শীতলতা ঝেড়ে ফেলে। জীবনের শিখা উঠল জ্বলে।

তবু এ অজানা যাত্রার ক্ষণে বড় আদরের অনেক প্রাণের দাগভরা গ্রামখানির জন্য ওর সকল মন কেঁদে উঠল। ভাঙা মন্দিরের উঁচু বাতিটা জ্বলছে টিমটিম করে। গাছগুলো সব হাত বের করে ওকেই ডাকছে। পাশের কালো দীঘিটা সজল চোখ তুলে চেয়ে আছে যেন।

রাতের নীরবতার মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়া এল শোঁ শোঁ করে দূরের বার্তা নিয়ে।

সমীর তাকাল আকাশে। দুটি তারা এতক্ষণ জ্বলছিল পাশাপাশি। সহসা একটি ছুটে গেল অকূল আঁধারে। দুটি হাত কপালে ঠেকিয়ে সমীর সামনের সীমাহারা অন্ধকার প্রান্তরে পা বাড়াল।

পিছনে রইল পড়ে সঞ্চিত অতীত। রইল ঘুমানো মানুষের দল। রইল মামার সংসার, রইল দিদি, রইল মধু বোস, রাখাল ও তার রুগ্ন বাপ। রইল পড়ে মানুষের হাতে মানুষের অবিরাম লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কাহিনী।

সমীর চলল এগিয়ে। জীবনের আগুন ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

॥ তিন ॥

উদ্‌ভ্রান্ত কিশোর কোথায় চলেছ ?

দিগন্ত আঁধার করে যে নেমে এল রাত। নিশ্ছিদ্র কালো আঁধারে যে ঢেকে যাবে পথের রেখা।

রূপকথার দৈত্যের মত পথের পাশে হাজার হাত মেলে দাঁড়ানো বটগাছের ডালে ডালে ডানা ঝাপ্‌টাবে বাদুড়ের দল—একটানা ক্লান্ত স্বর ডাকবে শকুনির ছানা।

মধ্যরাত্রের অন্ধকারে পথের পাশে পাশে অতর্কিতে জ্বলে উঠবে হিংস্র শ্বাপদের জ্বলন্ত চোখ। যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে সে লাফিয়ে পড়বে তোমার উপরে। কি দিয়ে তুমি আত্মরক্ষা করবে। কোন্ হাতিয়ার আছে তোমার হাতে ?

নেই। আত্মরক্ষার কোন অস্ত্র নেই তোমার হাতে। তুমি একান্ত নিঃসম্বল। অসহায়।

হন্ হন্ করে পথ চলতে চলতে মাথাটাকে বারবার ঝাঁকুনি দেয় সমীর। নিজের মনেই যেন বলে ওঠে : না না, আমি অসহায় নই। নিঃসম্বল নই। সহায় আমার শুভ সংকল্প। সম্বল আমার কৈশোরদীপ্ত দেহ আর বীর্যময় মন। কোন বাধা, কোন বিঘ্নকে আমি মানি না। আমি যাবই। এগিয়ে আমি যাবই।

নবীন উদ্যমে আবার পা চালিয়ে দেয় সমীর।

পথ চলে আর ভাবে। মনে ওর অনেক টুকরো চিন্তা। ছড়ান এলোমেলো হরপের মত অসংলগ্ন, অর্থহীন।

মনে পড়ে বাবা ও মার কথা। গুরুগম্ভীর ওর বাবার পড়বার

ঘর। স্কুলের বড় লাল দালান। পিছনে তার রেল রাস্তা, ডাইনে মাঠ, সামনে মস্ত দীঘি—যাতে ওরা খেলত জলচোর।

মনে পড়ে ছুটিতে ওরা সবাই যেত বাড়ি। কাঁচা রাস্তার বুকে ঘড় ঘড করে ওদের ঘোড়ার গাড়ি ছুটত। দুপাশে গাছের সারি আর দূরে মাঠ। তারপর ছোট্ট জঙ্গলা-ঢাকা গাঁয়ের কালীঘর, পানাপচা পুকুর, আমবাগান, বাউল-বুড়োর আশ্রম, আর সেই বড় আদরের বাড়ি—যা দিদির বিয়ের জন্য ওর মামা কাকে যেন বেচে দিল।

দিদির কথা মনে পড়তেই বুকটা ছ্যাং করে ওঠে। ভাবনার সুতা ছিঁড়ে যায়।

আচমকা একটা ধাক্কা লাগে পথচারীর সঙ্গে।

পাশের পথচারী রেগে বলে, চোখে দেখেন না মশায়।

চোখ!

অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনার সতর্ক দৃষ্টি।

সত্যি সে-দৃষ্টি সে-চোখ তখন ছিল না সমীরের।

কোন কিশোরেরই থাকে না। সে-দৃষ্টি যে জীবন-পথের অনেক অভিজ্ঞতার ফল।

সমীর হাতজোড় করে বলে, সত্যি দেখতে পাই নি দাদা। কিছু মনে করবেন না।

হুঃ বলে পথচারী পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

সমীর আবার পা চালায়।

রাতের আঁধারে ঘরছাড়া বেপরোয়া পথিক একমাত্র-পল্লী আতিথ্যের সম্বলে দুদিনের পথ কাটিয়ে কলকাতার পীচের রাস্তায় পা দিল একদিন।

অপরিচিত কলকাতা, অকূল কলকাতা, বিরাট কলকাতা। রূপকথার দানবপুরীর মত সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর কলকাতা।

নিরাশ্রয় সমীর এর চাপে হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। এ তো পল্লী নয়।

যেখানে সেখানে শ্যামল স্নেহময় কোল এখানে মেলে না। দুয়ারে দুয়ারে কলার পাতায় আহার এখানে স্বপ্ন-অলীক।

কলের জল ও পাকাবাড়ির রকের আশ্রয়ে দু'রাত কেটে গেল। পরদিন প্রথম সূর্যের সঙ্গেই ওর বুকের তলে একটা ব্যথা চিনচিন করে উঠল।

তবু ও নামল পথে। সারাদিন ঘুরল চরকির মত পথ আর মানুষ দেখে দেখে।

সন্ধ্যার কিছু আগে কলের জল মুখে দিতেই পেট কামড়ে বমি হল একটু। শরীর এল ঝিমিয়ে।

মাথার ভিতর ভেজা পাটকাঠিতে আগুন ধরান জমাট ধোঁয়া। সব শূন্যে ঘুরছে বুঝি।

কাঁপতে কাঁপতে একটা দেওয়ালের পাশে সমীর শরীরটাকে টেনে ফেলল।

ধীরে তন্দ্রা এল সকল ব্যথার উপর শান্তিজল নিয়ে।

তন্দ্রা যখন টুটল, সন্ধ্যা তখন গাঢ় হয়ে নেমেছে। পাদপথে অজস্র মানুষ চলেছে নানা ভঙ্গীতে। উৎসাহ ও আনন্দ তাদের প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠ্‌ছে।

সমীর দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু শরীর তাকে টেনে রাখল নীচে।

ধীরে পথ নির্জনতর হতে লাগল। কোলাহল এল থেমে।

সমীরের মনে পড়ল, এমনি কত রাতে দিদির কোলে শুয়ে ভবিষ্যতের কত উজ্জ্বল স্বপ্নই সে দেখেছে। চোখ থেকে ওর জল গড়িয়ে এল কয়েক ফোঁটা বড় দুঃখে।

কিন্তু পেটের ভিতর যে ভূতের নাচ সুরু হয়েছে। কাদের যেন তীক্ষ্ণ নখ পেটের নানা কলকব্জাকে টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।

অসহ্য যন্ত্রণায় সমীর পড়ে পড়ে কাতরাতে লাগল—মাগো।

পাশ দিয়ে কয়েকজন লোক চলে গেল।

সমীর বড় আশায় মুখ খুলল, কে তোমরা দাদা, না খেয়ে আমি মারা যাচ্ছি—

জবাব এল ঝাঁজাল গলায়, দিব্যি শরীর আছে, খেটে খাও না বাপু।

হায়রে অযাচিত উপদেশ। অথচ খাটবার সংস্থান কেউ করে দিতে পারে না। আঁধার আকাশের দিকে চেয়ে সমীর বলল কথা কয়েকটি।

এমন সময় একটি সুদর্শন যুবক এগিয়ে এসে তাকে শুধাল, কি হয়েছে ভাই তোমার? কোথা থেকে এসেছ?

মরণ-পথের ধারে সহানুভূতির এ মধু-বাণী সমীরকে যেন জীবন দিল। উঠে বসে ও বলল, এসেছি কত দূর থেকে তা বলতে পারব না। আজ তিন দিন জল ছাড়া আর কিছু খাই নি। শরীর তাই ভেঙে পড়েছে। তার উপর বুকে একটা ব্যাথা—

বাধা দিয়ে যুবক শুধাল, কেন এসেছ?

কি উত্তর সমীর দিবে? কেন যে এসেছে তা ত ও নিজেই জানে না।

উদাস স্বরে বলল, পথের সন্ধানে।

যুবকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চাইল—পথের ধূলায় বুঝি পদ্মরাগ ও পেয়েছে।

সমীর আবার বলল, ছিলাম পাড়াগাঁয়ে। কিন্তু থাকতে পারলাম না। তাই এসেছি, দেখি যদি শহরে নিজের একটু স্থান করে নিতে পারি।

যুবকটি বলল, বেশ তো, চল আমার সঙ্গে তোমায় একটা কাজ জুটিয়ে দেব।

কি কাজ?

কাজ অবিশ্যি খুব সামান্য। কারখানায় দিন-মজুরী। তাই করি আমি।

কারখানায় দিন-মজুরী।

কথাটা ধ্বক্ করে বুকে বিঁধল সমীরের।

তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, কি কাজ আপনি করেন কারখানায়।

যুবকটি হেসে বলল, আপনি নয়, বল তুমি। আপনি কথাটা কানে বড় দূর দূর শোনায়।

অবাক বিস্ময়ে তার দিকে চোখ মেলে তাকাল সমীর।

অপরিচিত নিষ্ঠুর মহানগরে এ কোন্ স্নেহময় এসে দাঁড়াল তার সামনে।

যুবকটি হেসে বলল, হ্যাঁ, যা জিজ্ঞাসা করছিলে। কি কাজ কারখানায়? হাতুড়ি পিটি, লোহা কাটি, আগুনের মধ্যে লোহা ফেলে তাকে পিটাই। যন্ত্র তৈরি করি। এমনি কত কি।

এই কাজ!

সমীরের আশার স্বর্গ-রথ অর্ধ পথে থেমে গেল।

সংসারে বড় হবার একটা উদগ্র কামনা বুকে নিয়ে ছুটে এসে শেষে কি কারখানার মজুর হতে হবে?

যুবক প্রশ্ন করল, কত দূর পড়াশুনা করেছ?

স্কুল-ফাইনাল পাশ করেছি।

যুবক হেসে বলল, তাই বুঝি আত্মসম্মানে আঘাত লাগল?

এ প্রশ্নের জবাব সমীরের জানা নেই। ও চুপ করে রইল।

যুবকটি বলতে লাগল, অপমানের ত এতে কিছু নেই। যে দেশে অগণিত মানুষ প্রাণপাত পরিশ্রমেও পেটের খাবার জোটাতে পারে না পরিশ্রমকে ঘৃণা করা সে দেশের তরুণের পক্ষে মহাপাপ।

অবাক বিস্ময়ে সমীর ওর মুখের দিকে চাইল।

এই কি হকারে চেহারা, না তাদের অশিক্ষিত মুখের কথা। এ যে অবনত জাতির পথ-দেখান বাণী।

যুবকটি উৎসাহে বলে চলল, নিজের মুখের গ্রাস নিজে করে খাবে,

এও কি ফুটপাতে পড়ে মরার চেয়ে বেশী লজ্জার কথা। তাছাড়া, চিরদিন তোমায় এ কাজ করতে হবে না। তরুণ জীবন, লেখাপড়া জান। দ্রুত এগিয়ে যাবে উন্নতির পথে। জীবনকে করবে সার্থক। দেশকে করবে উজ্জ্বল।

সমীর সোৎসাহে বলল, তুমি যা করতে বলবে তাতেই আমি প্রস্তুত।

হাত বাড়িয়ে সমীরকে টেনে তুলতে তুলতে যুবক বলল, বেশ, তবে এস আমার সঙ্গে।

অপরিচিত মহানগরের বুকে প্রথম আশ্রয় পেল সমীর।

চার ॥

উত্তর কলকাতার একটি ছোট বস্তি।

সামনে একটি নাতিবৃহৎ পার্ক। পার্কের একপাশে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নতুন বের-করা চওড়া বড় রাস্তা। চারধারেই নতুন এবং পুরনো সব সুরম্য অট্টালিকা। তারি মাঝে এক কোণে কেমন করে যেন টিকে আছে ছোট এক টুকরো একটা বস্তি। বস্তিগুলোতে প্রধানত কয়েক ঘর গোয়ালার বাস।

সেই বস্তিরই একেবারে সামনের সারির একখানি মাঠকোটা ঘর। পাকা মেঝে। মাটির দেয়াল। টিনের ছাউনি। বড় ঘর-খানাকে মাটির দেয়াল দিয়ে পার্টিশান করে দুই ভাগ করা। তারি একখানি ঘরে সমীরের হাত ধরে এসে উঠল যুবক।

যুবকের নাম তিমির। হাওড়া অঞ্চলের একটা কারখানায় কাজ করে।

চাবি ঘুরিয়ে দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকল তিমির। সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

বলল, এস ভাই। এই আমার আস্তানা। আপাতত এখানেই তোমাকে থাকতে হবে।

একে দিনমজুরী, তার উপর বস্তির ঘরে বাসা। প্রথম ধাক্কাতেই মন কেমন যেন চমকে উঠেছিল সমীরের। ভিতরে ঢুকে কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

ঘরখানি ছোট। নিরাভরণও বটে। কিন্তু ছোট ঘরখানির চারদিকে ছড়িয়ে আছে সুরুচি ও সৌন্দর্যের একটা সহজ মাধুর্য। ছোট তক্তপোষে ধপধপে বিছানা। একপাশে একটা ছোট টেবিলে

কয়েকখানি বই ও টুকিটাকি জিনিষপত্র সুন্দর ভাবে সাজানো। এক কোণে কাচের গ্লাসে ঢাকা একটা কালো কুঁজো। দেয়ালে দুখানি মাত্র ছবি। সোনালি কাজ-করা ফ্রেমে আঁটা মস্ত বড় একটি অয়েল-পেন্টিং-এ একজন মহিলার ছবি। ছবি ও তার ফ্রেম এ-ঘরের পক্ষে একান্তই বেমানান। দেয়ালের আর এক কোণে টেবিলের উপরে ছোট একখানি রবীন্দ্রনাথের ছবি। নিচের ধূপদানিতে কয়েকটি ধূপকাটি সাজানো।

সব দেখেশুনে অবাক বিস্ময়ে তিমিরের দিকে তাকাল সমীর।

গায়ের জামা খুলে ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে তিমির বলল, কি দেখছ আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে?

বিমুগ্ধ গলায় সমীর বলল, দেখছি তোমাকে? তুমি কে?

হেসে জবাব দিল তিমির, পরিচয় তো আগেই দিয়েছি। কারখানার মজুর। আর নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ, বাস করি এই বস্তিতে। অতএব বস্তিবাসীও বলতে পার।

ঠাট্টার কথা নয় দাদা, সত্যি করে বল না কি তোমার আসল পরিচয়। বস্তিবাসী মজুর তো তুমি নও।

তেমনি হেসেই তিমির বলল, কেন? বিছানাটা একটু ধপধপে, আর দেয়ালে দুখানা ছবি থাকলে কি সে মজুর হতে পারে না? বস্তিবাসী দিনমজুররা কি মানুষ নয়? তাদের মনে কি কোন রকম সৌন্দর্যবোধ থাকতে পারে না?

এ-প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারল না সমীর। কলকাতার বস্তি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা তার নেই। আজ পর্যন্ত কোন বস্তি সে চোখেও দেখেনি। লোকের মুখে বস্তির যে নোংরা বর্ণনা সে শুনেছে তার সঙ্গে তিমিরের গৃহস্থালির তিলমাত্র মিল খুঁজে না পেয়েই মনের আবেগে প্রশ্নগুলো সে করে ফেলেছিল। তিমিরের প্রশ্নের কোন জবাব তাই সে দিতে পারল না। শুধু আমৃতা আমৃতা করে প্রশ্ন করল, ও পেন্টিংটা কার দাদা?

বড় অয়েল-পেন্টিংটার দিকে চেয়ে একটুখানি চুপ করে থেকে তিমির গম্ভীর গলায় জবাব দিল, আমার মার।

সমীরও তাই আন্দাজ করেছিল। ছবিখানির দিকে চেয়েই সে বলল, তোমার দেশ কোথায় দাদা?

চম্‌কে সমীরের মুখের দিকে চোখ ফেলল তিমির। ধীরে ধীরে বলল, আমার এই আস্তানায় যখন জুটেছ তখন ধীরে ধীরে সবই জানতে পারবে। আপাততঃ ও সব আলোচনা থাক। তুমি অভুক্ত। আমারও সারাদিনের কাজের পরে ক্ষিদে পেয়েছে। চল আগে ডান হাতের কাজটা সেরে আসিগে।

দেয়ালের ব্র্যাকেট থেকে কাপড় ও গামছাখানা হাতে নিয়ে তিমির বলল, তোমার ওই পুঁটুলিতে কাপড়-গামছা আছে তো?

সমীর ঘাড় নাড়ল, তা আছে।

তাহলে সেগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে এস।

কোথায়?

মৃদু হেসে তিমির বলল, কথায় বলে ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। আমার অবস্থা অবিশ্যি অতটা শোচনীয় নয়। আমার শয়নের এই বাঁধা আস্তানাটা আছে, তবে ভোজনং হট্টমন্দিরে। অতএব সেই হট্টমন্দিরেই যাই চল।

কথাগুলো ঠিক মত বুঝতে না পেরে সমীর হাঁ করে তিমিরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তিমির বলল, বুঝতে পারলে না তো? আরে, কথাটা খুব সরল। কাছেই গলির ভিতরে একটা সস্তা দরের হোটেল আছে। সেই হোটেলেই আমার দুইবেলার খাবারের বাঁধা বরাদ্দ।

কিন্তু হোটেলে এই কাপড়-গামছা নিয়ে কেন?

তাও বলছি। স্নানাদির একটা বারোয়ারি ব্যবস্থা আমার এই বস্তিবাড়িতেও আছে। তবে সেটা যেমন নোংরা তেমনি বে-আব্রু। তাই বিশেষ দরকার না হলে সে-সব আমি ব্যবহার করি না।

তাছাড়া তুমি নতুন মানুষ! রাত করে সেখানে তোমার অসুবিধাও হবে। তাই হোটেলেই এক সঙ্গে স্নানাহার দুইই সেরে নেব।

কয়েকদিন পরে পাইস-হোটেলের পর্যাপ্ত আহারে উদরপূর্তি করে হৃষ্টচিত্তেই তিমিরের মাঠকোটার ঘরে ফিরল সমীর।

ঘরের সামনেই লাল সিমেণ্টের একটুখানি বাঁধানো রক। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে দুই জনে বসল সেইখানে।

পার্কটা জন-বিরল হয়ে এসেছে। এখানে-ওখানে দু'চার জন বেঞ্চিতে বসে আছে চুপচাপ। বড় রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলেছে দু'চার-খানা।

পার্কের এই কোণটায় অনেকগুলো কলাবতী ফুলের ঝাড়। নির্মেঘ আকাশের চাঁদের আলোয় কলাবতীর ফুলগুলি বাতাসে ঈষৎ দুলছে।

খুশি মনে সেইদিকে চেয়েই চুপ করে বসে ছিল সমীর।

সে নৈশঃব্দ্য ভঙ্গ করল তিমির। হাল্কা গলায় বলল, তারপর ভাই, এইবার তোমার খবর কিছু বল। অবশ্যি বলতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে।

সমীর বলল, না না, আপত্তি কিসের? বিশেষত তোমার কাছে।

আমি হঠাৎ এমন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলাম কোন্ গুণে?

নিরাশ্রয় পথের মানুষকে যে পথ থেকে হাত ধরে এনে ঘরে আশ্রয় দেয় তার কি কোন গুণের অভাব আছে বলতে পার?

বাপরে। ভাই আমার দেখছি কথায় একেবারে বৃহস্পতি। বৃহস্পতির অংশে জন্ম বুঝি?

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল সমীর, কথাটা হয়তো তুমি কথার ছলে ঠাট্টা করেই বলেছ দাদা, কথাটা কিন্তু আসলে সত্যি।

তার মানে?

আমার বাবা ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। বৃহস্পতির মতই পণ্ডিত।

তিমির সলজ্জ গলায় বলল, তুমি কিছু মনে করো না ভাই। তোমার বাবা আমার পূজনীয় মানুষ। তাঁকে ভেবে কথাটা আমি বলিনি। ভাল কথা, তোমার বাবা কোন্ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন?

স্কুলের নাম বলল সমীর।

নামটা শুনেই চম্‌কে উঠল তিমির। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করল, কি স্কুল বললে?

আবার স্কুলের নাম বলল সমীর।

সাগ্রহে তিমির বলল, তোমার বাবার নাম কি বল তো?

বাবার নাম বলল সমীর।

নাম শুনেই হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল তিমির। চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। নিজের অজ্ঞাতেই একটা দীর্ঘশ্বাসও বুঝি বেরিয়ে এল বুকের ভিতর থেকে।

খানিক পরে বলল, তোমার বাবা কতদিন মারা গেছেন সমীর?

তা অনেকদিন হল—আমি তখন ক্লাস ফোরে পড়ি।

হুঁ বলে চুপ করল সমীর।

একটি কিশোরীর লাজরক্ত মুখের ছবি বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। বুকের ভিতর কিসের যেন এক অবুঝ ঝড়ের উথাল-পাথাল।

মহানগরীর নির্মম ফুটপাথ হতে এ সে কাকে কুড়িয়ে এনেছে!

এ পরশমাণিক সে রাখবে কোথায় তার মাটির ঘরে!

সাগ্রহে তিমির আবার প্রশ্ন করল, বাড়িতে তোমার আর কে কে আছেন?

সমীর নিস্পৃহ গলায় জবাব দিল, বাড়ি-ঘর তো কিছু নেই। একমাত্র দিদি আছে।

কেন? তোমার মা?

আমি বড় দুর্ভাগা দাদা। মাও ছোট বেলায়ই আমাদের মায়া কাটিয়েছেন। দিদিই আমাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে।

বুঝেছি।. বিয়ের পরে দিদিও শ্বশুরবাড়ি পাড়ি দিয়েছে, আর তুমিও অমনি পথের সন্ধানে পা বাড়িয়েছ। কি বল ?

তাহলে তো নিজের ভাগ্যকে ভাল বলেই মানতে পারতাম। দিদির ভাগ্য আমার চেয়েও খারাপ।

কি বলছ তুমি ? তিমিরের গলায় দারুন উৎকণ্ঠা।

বিয়ের কিছুদিন পরেই দিদি বিধবা হয়েছে। দাসী-বাঁদির মত দিন কাটাচ্ছে মামার বাড়িতে।

সমীরের শেষের কথাগুলো আর কানে গেল না তিমিরের। তিন অক্ষরের ছোট্ট বিধবা শব্দটা যেন একটা প্রাণঘাতী বুলেটের মত তার হৃদপিণ্ডটাকে একেবারে দীর্ণ করে দিল। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হল না। আহত পশুর মত তীব্রকণ্ঠে একবার মাত্র আঃ বলে আর্তনাদ করেই সে চুপ করে গেল।

বিস্মিত সমীর বলল, কি হল দাদা ? তুমি হঠাৎ অমন করে উঠলে কেন ?

অন্তরের তীব্র যন্ত্রণাকে যথাসম্ভব সংযত করে তিমির কোন রকমে বলল, ও কিছু নয়। বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেমন করে উঠল। তুমি বস, আমি আসছি।

বলতে বলতেই রক থেকে উঠে ঘরে ঢুকল তিমির। কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে ঢক্ ঢক্ করে সবটা জল এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ করে ফেলল। তক্তপোষের উপর একটা হাত রেখে স্থির অচঞ্চল হয়ে অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বাইরে এসে বলল, রাত অনেক হল ভাই। এবার শোবে এস।

একই বিছানায় পাশাপাশি দুজন শুয়ে পড়ল।

একটি কথাও আর হল না দুজনের মধ্যে।

ক্লান্ত অবসন্ন সমীর চোখের পাতা বুজতে না বুজতেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ঘুম এল না তিমিরের দুটি তপ্ত চোখে, একই মুখের দুখানি ছবি পাশাপাশি এসে তার দুই চোখের সব ঘুম হরণ করে নিল।

॥ পাঁচ ॥

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল সমীরের।

ঘুমের মধ্যেই ও যেন শুনতে পেল, অতি মৃদু সস্নেহকণ্ঠে বার বার ওর নাম ধরে ডাকছে তিমির। বলছে, সমীর—ভাই—ওঠ—ওঠ—

তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসল সমীর। চোখ কচলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল, রাত তখনও শেষ হয় নি। সবে ভোর হয়-হয়।

সবিস্ময়ে সমীর বলল, কি ব্যাপার দাদা? এত ভোরে আমাকে ডেকে তুললে কেন বল তো?

মিষ্টি হেসে তিমির বলল, তোমার খুব কষ্ট হল তা বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করবে ভাই, এ-দাদার এখানে থাকতে এমনি আরও অনেক অসুবিধাই তোমাকে ভুগতে হবে।

তিমিরের কথাগুলো বুঝতে না পেরে সমীর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল।

তিমির বলল, প্রাতঃকৃত্যাদি যা কিছু এই বেলা চটপট সেরে নাও ভাই। এরপর আর ভাড়ে ওদিকে এগোতে পারবে না। ভুলে যাচ্ছ কেন যে এটা কলকাতার বস্তিবাড়ি?

ওহোঃ বলে সমীর গামছা কাঁধে নিল। তিমির পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে গেল বাড়ির ভিতরে কলতলায়।

ঘরে ফিরে এসে ট্রাংক খুলে ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় বের করে সমীরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এগুলো পরে নাও চটপট। চল, চা খেয়ে আসি।

চা খেতে যাব তাতে আবার ধোয়া জামা-কাপড় কেন দাদা? এই তো বেশ আছে।

তোমার কাছে হয়তো বেশ আছে, কিন্তু আমার কাছে নয়।

তার মানে ?

সব কথার মানে জেনে তোমার দরকার নেই। দাদা বলে যখন ডেকেছ তখন যা বলি নির্বিবাদে তাই করে যাও। শুধু একটা কথা জেনে রাখ, আমার দ্বারা তোমার মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল কখনও হবে না।

তিমিরের কথার মধ্যে এমন একটা অতলস্পর্শ গভীরতা এবং অকপট গাম্ভীর্য ছিল যে সমীর শুধু অপার বিস্ময়ে তার দিকে হাঁ করে চেয়েই রইল। কোন কথাই আর তার মুখ দিয়ে বের হল না। তারপর সুবোধ বালকের মত তার হাত থেকে নিয়ে পাট-ভাঙা জামা-কাপড় পরে তিমিরের পিছনে পিছনে হোটেলের পথ ধরল।

হোটেলে প্রাতরাশ খেতে বসে অনবরত এটা খাও ওটা খাও করে তিমির সমীরকে একেবারে তটস্থ করে তুলল। সমীর যত আপত্তি করে, বলে আর আমি খেতে পারছিনা, তিমির তত জিদ করে, আদর করে বলে, আর একটা মিষ্টি খাও লক্ষ্মী ভাইটি। আরও বলে, আচ্ছা সমীর, আমি যদি তোমাকে খাইয়ে তৃপ্তি পাই, তাহলে দয়া করে একটুখানি খেতে তোমার এত আপত্তি কেন ?

এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে সমীর ?

অগত্যা ঘাড় নিচু করে একটার পর একটা খাবার নীরবে গলধঃ-করণ করে সমীর। আর ভাবে, অপরিচিত একটি নিরাশ্রয় যুবককে এত আদর-যত্ন কেন করছে এই আশ্চর্য মানুষটি ?

আর শুধু সেই প্রাতরাশ খাবার বেলাতেই নয়, সেদিন থেকে তার প্রতিটি কথায় প্রতিটি আচরণে সমীরের প্রতি এমন অযাচিত স্নেহ ও ভালবাসা ঝরাতে লাগল তিমির যে সমীর অনেক ভেবেও তার কোন কারণ আবিষ্কার করতে পারল না।

দুপুরে সকাল-সকাল স্নানাহার সেরে কাজে বের হবার আগে তিমির বলল, কয়েকদিন পর পর তোমার শরীরের উপর অনেক ধকল

গেছে সমীর, আজ সারাটা দুপুর তুমি একটানা বিশ্রাম নাও। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কোথাও বেরিও না। বিকেলের জন্য তোমার জলখাবার ওই টেবিলের উপর ঢাকা রইল। সুবিধা মত খেয়ে নিও। আমার জন্য অপেক্ষা করো না।

সমীর অপরাধীর মত আমতা আমতা করে বলল, বিশ্রাম তো কাল সারা রাতই নিয়েছি। ভরপেট খেয়েছিও দু'বেলা। শরীর আমার বেশ ঠিক হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গেই আমিও কেন বের হই না। আমাকে যে তোমাদের কারখানায় একটা কাজ করে দেবে বলেছিলে—

বাধা দিল তিমির, বলেছিলাম, কাজ একটা ঠিক করে দেব। তার এত তড়িৎ-ঘড়িৎ কিসের? সে ধীরে সুস্থে যা করবার আমি ঠিক করব। সে জন্য তোমায় ভাবতে হবে না।

সমীর তবু বলল, ভেবে আর আমি করবই বা কি। তবু—

দাদার পয়সায় পেট ভরে খেতে আত্মসম্মানে আঘাত লাগছে, যাহোক একটা কাজকর্ম জুটিয়ে এখান থেকে সরে পড়তে চাও, এই তো?

খুব দ্রুত একটানা কথাগুলি বলল তিমির। তার কণ্ঠস্বরে আহত অভিমানের ছোঁয়া।

সমীর তাড়াতাড়ি বলল, না না, সে কথা আমি ভাবি নি। তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা দাদা! বেশ, আর কোন কথা বলব না। তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই ঘরেই নট-নড়ণ-চড়ণ হয়ে শুয়ে থাকব। কেমন হল তো?

এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা, বলে তার মাথায় আলতো ভাবে হাতটা ছুঁইয়ে তিমির দরজা ঠেলে পথে বেরিয়ে গেল। তার গমন-পথের দিকে চেয়ে আকাশ-পাতাল অনেক কিছুই ভাবতে লাগল সমীর।

ভাবতে ভাবতেই এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল সমীর।

'ভাঙল ঘুম বিকেল নাগাদ বহুকণ্ঠের এক বিচিত্র কলরবে।

কান পেতে কিছুক্ষণ শুনল সমীর। অনুমানে বুঝতে পারল, বাড়ির পিছনের কলতলা থেকেই আসছে সে কলরব। কৌতূহলী হয়ে ঘরের ভিতর দিককার জানালাটা খুলে মুখ বাড়াল। কলতলার অনেকখানিই সেখান থেকে চোখে পড়ে।

যেন ছোটখাট একটা হাট বসেছে কলতলায়। কেউ জল ভরছে বাল্‌তি-কলসিতে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে কাপড়-গামছা নিয়ে, কেউ দাঁত ঘসছে, কেউ বা হাজা-পড়া পা ঘসছে ঝামা দিয়ে। এক পাশে হাত নেড়ে নেড়ে কারা যেন ঝগড়া বাঁধিয়ে বসেছে একটা। সম্ভবতঃ এখানকার জল-কলের অব্যবস্থা নিয়েই নালিশ-বিচার চলেছে।

নিজের মনেই একটু হাসল সমীর। তিমির কেন যে রাত থাকতে ডেকে তুলে তাকে কলতলায় পাঠিয়েছিল ও-বেলা এতক্ষণে সেটা যেন সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হল সমীরের।

ভাবল, হায়রে মানুষের জীবন, আর হায়রে জীবনযাত্রার অব্যবস্থা! এমনি করে দিনের পর দিন বছরের পর বছর বংশপরম্পরায় ধরে পৃথিবীর বুকে যারা বাঁচে আর মরে, তারাও কি মানুষ? মানুষের অধিকার নিয়েই কি তারাও আসে ধরনীতে? তাহলে মানুষে মানুষে কেন এই অসাম্য ও ব্যবধান? কবে—কি ভাবে—কোন্ পথে হবে এর প্রতীকার?

জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে আবার বিছানায় ফিরে গেল সমীর।

টেবিলের উপর চোখ পড়তেই এগিয়ে গেল সেখানে। ডিসের উপরকার ঢাক্‌নাটা খুলল। চারটি মিষ্টি সাজানো রয়েছে।

হঠাৎই যেন চোখের পাতা দুটো ভিজে এল সমীরের। পূর্ণ জ্ঞান হবার পরে একমাত্র দিদি ছাড়া তার জন্যে এমন করে ভাবতে তো আর কারুকে কখনও দেখে নি সে। অপরিচিত এই নির্মম নিষ্ঠুর কলকাতায় এমন স্নেহ-যত্নে ভরা আশ্রয় যে তার জন্যে রচিত হয়ে ছিল এ-কথা কি কাল সন্ধ্যায়ও সে কল্পনা করতে পেরেছিল?

অথচ সেই কল্পনাতীত সম্ভাবনাই আজ সত্য হয়েছে তার জীবনে।

এ কার নির্দেশে? কোন্ জীবন-বিধাতার?

সমীর একবার ভাবল, খাবারটা যেমন ছিল তেমনি ঢাকা দিয়ে রেখে দেবে। তারপর তিমির ফিরে এলে দুজনে এক সঙ্গে খাবে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তিমিরের নির্দেশ। তার জন্যে অপেক্ষা না করেই খাবারটা যেন সে খেয়ে নেয়। এখন না খেলে সে হয় তো ফিরে এসে রাগ করবে। অভিমানে ক্ষুব্ধ হবে।

একটুখানি ভেবে আর একটা ডিস্ ভাল করে ধুয়ে দুটো মিষ্টি তাতে তুলে ভাল করে ঢাকা দিয়ে বাকি মিষ্টি দুটো সে খেয়ে নিল।

খেতে খেতেই দিদির মুখখানিই আর একবার তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। আহা! না জানি কত কষ্টেই তার দিনগুলো কাটছে মামা-মামীর অত্যাচারে আর গঞ্জণায়!

সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফিরল তিমির।

ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করল, জলখাবারটা খেয়েছিলে?

সমীর ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, তবে—

আবার তবে কি?

মৃদু হেসে সমীর বলল, তোমার ভাগটা রেখে দিয়েছি।

আরও জোরে হেসে তিমির বলল, বটে! তা ভাগটা সমান সমান করেছ তো?

নিশ্চয়। দুই ভাই যখন, তখন ভাগও সমান সমান।

বেশ, বেশ! তা কোন রকম অসুবিধা হয় নি তো তোমার?

না। সংসারে এক দিদি ছাড়া আর কেউ যে আমাকে এমন সুবিধায় রাখতে পারে তোমাকে না দেখলে তা তো আমি ভাবতেই পারতাম না।

বলো কি সমীর! একদিনের পরিচয়েই আমাকে একেবারে

আজন্মের দিদির পর্যায়ে তুলে ফেললে? এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না কি?

মোটেই না। বরং কাল থেকে তোমাকে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জান দাদা—

কি?

মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা পূর্ব জন্মের।

এ ধারনার হেতু?

নইলে মাত্র একটি সন্ধ্যার পরিচয়ে মানুষ কখনও মানুষকে এতখানি কাছে টেনে নিতে পারে?

এমনি ধরণের নানা টুকরো আলাপচারির ভিতর দিয়ে সময় কাটতে থাকে।

গায়ের জামা খুলে বিছানায় গ্যাঁট হয়ে বসে হাতপাখাটা ঘোরাতে ঘোরাতে তিমির এক সময়ে বলল, আচ্ছা সমীর, তোমার দিদি তো মামা-বাড়িতে থাকে বলছিলে না?

হ্যাঁ। দিদির বড় কষ্ট।

কেন বল তো? মামা-মামি কি তাকে ভালবাসে না?

ভাল না বাসুক তাতে দুঃখ নেই। মামা-মামি দিদিকে বড় কষ্ট দেয়।

একটু চুপ করে থেকে তিমির আবার বলল, তাহলে সে কষ্টের মধ্যে দিদিকে একলা ফেলে তুমি একা চলে এলে কেন? তাকেও কেন আনলে না সঙ্গে করে?

দিদি যে কিছুতেই আসতে রাজী হল না। আমি তো কতদিন বলেছি, চল দিদি, এ নরককুণ্ড থেকে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই।

তাতে তোমার দিদি কি বলত?

দিদির মুখে ওই এক কথা—কোথায় যাব ভাই? যাবার ঠাঁই যে আমাদের কোথাও নেই। ভগবান যে আমাদের দুঃখকষ্ট সইতেই পাঠিয়েছেন এ জগতে, নইলে এমন দুর্দশা আমাদের হবে কেন ভাই?

তিমিরের বুকের মধ্যে অনেক কথার কলরোল। তারা যেন বলতে চায় অস্ফুট ভাষায়: আছে আছে ঠাঁই। উদার অকৃপণ নিঃসংশয় ঠাঁই। শুধু তুমিই জান না সে-ঠাঁইয়ের ঠিকানা। বুঝিবা ভুলেই গেছ। কিন্তু ভুলেই থাক আর স্মরণেই রাখ, ঠিক যেন এ-হৃদয়ের আলপনা-আঁকা আসন তোমারই আবির্ভাবের আশায় আজও অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু তোমার আসবার কি সময় হবে? সে শুভলগ্ন কি আসবে এ-জীবনে?

সমীর প্রশ্ন করল, কি ভাবছ দাদা?

চমকে উঠল তিমির। বলল, না, কিছু না। মানে—তোমার দিদির কথাই ভাবছিলাম।

দিদির কথা? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল সমীর।

অপ্রতিভ ভাবে কথা বলল তিমির, না—মানে—ভাবছিলাম, তোমার একটা কাজকর্মের সুবিধা হলেই তো তাকে এখানে নিয়ে আসতে পার, তাই না?

সমীর সোৎসাহে বলল, তা তো পারিই। আর আনবও তাকে নিশ্চয়। দিদি ছাড়া আমার আর কে আছে বল সংসারে?

ওঃ, আমি বুঝি একেবারে বানের জলে ভেসে যাব তখন?

বারে। তা কেন? তুমিও তখন থাকবে আমাদের সঙ্গে। ওঃ, সে যা মজা হবে না—

উল্লাসের আতিশয্যে কথাটা আর শেষ করল না সমীর। মাঝ-খানেই কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, কিন্তু দাদা, আমার চাকরির কি ব্যবস্থা করে এলে তোমাদের কারখানায় তা তো কিছুই বললে না?

তিমির বলল, কি যে বলব তাই তো ভাবছি।

সভয়ে সমীর বলল, কেন? কাজ জুটল না বুঝি?

না না, তা নয়, কাজ তোমাকে একটা জুটিয়ে দিতে পারব। কিন্তু আমি ভাবছি কি কাজ তোমাকে দেব?

সঙ্গে সঙ্গে সমীর বলল, কেন? যে কোন কাজ। সেই যে তুমি বলেছিলে, লোহা-লক্কড়ের কাজ। তাই একটা জুটিয়ে দাও না দাদা।

ধীরে ভাই, ধীরে। ডান হাত তুলে সরস ভঙ্গীতে তিমির বলল, তুমি তো বলছ জুটিয়ে দাও, কিন্তু আমি দেই কেমন করে?

কেন?

আরে ভাই, দিদির আদর-যত্নে তো নাড়ুগোপালটি হয়ে উঠেছ, এখন হুট্ বললেই ও ননীর হাত দিয়ে কি হাতুড়ি পিটতে পারবে? পারবে নারে ভাই, পারবে না।

বেশ তো, পারি কি না একবার পরীক্ষা করেই দেখ না।

তুমি তো বলছ পরীক্ষা করে দেখতে, কিন্তু শেষটায় তোমার দিদি যখন এখানে এসে আদরের ভাইটির এই দুর্দশা দেখে আমার উপর তম্বি করবে তখন কি হবে?

তিমিরের কথার ধরনে হেসে উঠল সমীর। বলল, উঃ, আমার দিদিকে দেখছি তোমার খুব ভয় দাদা। অথচ তাকে তো তুমি কখনও চোখেই দেখ নি। একবার দেখলেই কিন্তু তোমার এ ভুল একেবারে ভেঙে যাবে। আমার দিদি যাকে বলে একেবারে মাটির মানুষ। কারো উপর দিদি কখনও রাগ করে না।

উঁহুঃ, তুমি ঠিক জান না। রাগ সে ঠিকই করে, তবে মুখে বলে না।

তুমি কি করে জানলে দাদা। তুমি তো দিদিকে দেখ নি কোন দিন।

সব জিনিষ কি আর দেখে জানতে হয়। কিছু কিছু এমনিতেই বোঝা যায়। কিন্তু সে কথা যাক। সত্যি কি তুমি কারখানায় কাজ করবে সমীর? না, কোন আপিসে-টাপিসে কাজের চেষ্টা দেখব?

আপিস মানে তো সেই দশটা-পাঁচটা কলম পেষা? তাও আবার আমার এই স্কুল-ফাইনালের বিদ্যে নিয়ে? না দাদা, ও

কেরানিগিরিতে আমার লোভ নেই। আমি তোমার সঙ্গে তোমাদের কারখানাতেই কাজ করব।

পারবে তো?

দেখে নিও।

বেশ। তাহলে কাল যেও আমার সঙ্গে কারখানায়। ঘুরে ঘুরে ভাবী কাজের নমুনা সব দেখে এসো নিজের চোখে। তার পরেও এ কাজ করতে যদি তোমার মন চায়, ব্যবস্থা একটা করে দেব।

পরদিন তিমিরের সঙ্গে তার কারখানায় গেল সমীর।

আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞানের অন্য অনেক বিরাট কর্মশালার তুলনায় তিমিরদের কারখানাটা নেহাৎই ক্ষুদ্র, নিতান্তই তুচ্ছ। তবু সমীরের অনভিজ্ঞ চোখে এই যেন বিরাট—বিস্ময়কর।

সারাটা দুপুর ঘুরে ঘুরে কারখানাটার সব দিক ও দেখল। বিরাট কারখানার মাঝে ও যেন পেল এক দুর্দমনীয় প্রাণের সাড়া।

প্রকাণ্ড হাপরের সশব্দ গর্জনের সঙ্গে কয়লার চুল্লীগুলো যখন লেলিহান অগ্নি-জিহ্বা মেলে হা-হা করে জ্বলে ওঠে, সমীর বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে।

জ্বলন্ত লোহালক্কড়ের উপর অতিকায় হাতুড়ির ঘা পড়ে। সমীরের বুকের রক্তে যেন বেতালের নৃত্য শুরু হয়।

সমগ্র কারখানা-বাড়িটা নানা কর্ম-কোলাহলে গম্‌-গম্‌ করতে থাকে।

সমীর দেখে আর ভাবে: জীবনের সব চেয়ে সত্যিকারের প্রকাশ তো এই কর্মশালার মাঝেই। ভগবান বলেও যদি সত্যি কেউ থাকে, তবে সেও এই মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে কোন সুদূর স্বর্গে নয়, সে ভগবানের প্রকাশও কর্মের এই অসীম শক্তির ভিতরেই। কর্মশক্তিই ভগবান। স্রষ্টা তাঁর মানুষ নিজে। মানুষ যতই কর্মের পথে এগিয়ে চলে, ততই তার শক্তি বাড়ে, কর্মের অপ্রতিহত শক্তির কাছে একের

পর এক পরাজয় স্বীকার করে বিশ্ব-প্রকৃতি। আর মানুষ তার সেই অপরিসীম শক্তিকে পূজা করে এক কল্পিত স্বর্গের ভগবান রূপে।

কারখানার বিরাট কর্মচাঞ্চল্য সমীরকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে। ওর অনভিজ্ঞ কল্পনাবিলাসী তরুণ-মন নানা বিচিত্র কল্পনায় একেবারে মশগুল হয়ে যায়। নিজের মনেই ও ভাবতে থাকে ভবিষ্য-তের কথা, উজ্জ্বল অনাগতের কথা : এই কারখানায় ও কাজ করবে··· ধাপে ধাপে উঠবে উন্নতির শিখর হতে শিখরে···কর্মপথের শেষে ও পাবে জীবনের আকাঙ্খার বস্তু···মিটবে সকল ক্ষুধা।

বিকালে কারখানা থেকে ফিরবার পথে তিমির বলল, কেমন দেখলে সব?

সমীর গভীর আবেগে তিমিরের হাতখানা চেপে ধরে বলল, দোহাই তোমার দাদা, এই কারখানাতেই একটা কাজ আমাকে করে দাও। যন্ত্র-দেবতার পূজায়ই আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল তিমির। সমীরের মুখের দিকে তাকাল। ওর সারা মুখ কিসের যেন অনুপ্রেরণায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কোন্ অনির্দেশ্য জগতের একটা উজ্জ্বল আভা পড়ে জ্বল জ্বল করছে সারা মুখ।

দুই হাত সস্নেহে সমীরের কাঁধে রেখে তাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে তিমির বলল, বেশ, তাই হবে।

॥ ছয় ॥

সমীরের চিঠি :

শ্রীচরণেষু, দিদি, না জানি আমার জন্যে তুমি কত কান্নাই কেঁদেছ। হয়তো রাগও করেছ অনেক। কিন্তু কি করব দিদি, আমার অন্য কোন উপায় ছিল না। তুমিই বল, তোমাকে বলতে গেলে তুমি কি আমাকে আসতে দিতে? কিছুতেই দিতে না। তাই তোমাকে না বলেই একদিন পা বাড়িয়েছিলাম পথে।

শুনে সুখী হবে পথের সন্ধান আমি পেয়েছি। একটা কারাখানায় কাজ পেয়েছি। অতি সাধারণ মজুরের কাজ। কিন্তু তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না, এ-কাজে কত আনন্দ, কত উত্তেজনা। এ-কাজ পেয়ে আমি খুশি হয়েছি, এ-কাজের মধ্যে আমি পেয়েছি অপরিসীম আনন্দের সন্ধান, আমার অন্তরের তৃপ্তি। এর চেয়ে বেশী আর কি চাই বল?

কিন্তু না, তার চেয়েও বড় জিনিষ একটি পেয়েছি। আন্দাজ করতে পার সেটি কি জিনিষ? আমি জানি, তুমি পারবে না। তবে শোন। পথ চলতে এসে একটি দাদাকে পেয়েছি। তাঁর আশ্রয়েই আছি। সে যে কী আশ্রয় নিজের চোখে না দেখলে তুমি বুঝতে পারবে না। স্নেহে যত্নে আদরে ভালবাসায় দাদা বুঝি তোমাকেও হার মানায়। রাগ করো না দিদি, সত্যি বলছি, দাদাকে যতই দেখছি ততই মনে হচ্ছে সে বুঝি আর জন্মে সত্যি আমার দাদাই ছিল। নইলে মাত্র কয়েকটি দিনের পরিচয়ে মানুষ কি কখনও মানুষকে এত-খানি আপনার করে নিতে পারে?

কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য খবর একটি আছে দিদি। কি জান,

আমার কেবলই মনে হচ্ছে, কোন না কোন সূত্রে দাদার সঙ্গে বাবার পরিচয় ছিল। হয় তো বা তোমাকেও দাদা চেনে। কি করে বুঝলাম? কথাপ্রসঙ্গে একদিন তোমার কথা বলতেই দাদা হঠাৎ কেমন যেন চমকে উঠল! অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করল খুটিয়ে খুটিয়ে। কিন্তু তারপর থেকেই আমাদের বাড়ির প্রসঙ্গে আর কোন কথাই দাদা মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে না।

অথচ বুঝতে পারি এ বিষয়ে তার কৌতূহলের কিছু কম্‌তি নেই। আলোচনাপ্রসঙ্গে তোমার কথা উঠলেই কেমন তন্ময় হয়ে সব শোনে। তখন তাঁর দিকে চাইলে মনে হয়, মনের কোন্ অতলে যেন তলিয়ে গেছে। অবশ্য এ সবই আমার মন-গড়া কল্পনাও হতে পারে। আবার নাও তো হতে পারে। আমি তো অনেক ভেবেচিন্তেও দাদার এই ভাবান্তরের কোন কূল-কিনারাই করতে পারছি না। আচ্ছা দিদি, তোমার তো বুদ্ধিমতী বলে বেশ খ্যাতি আছে। তুমি কি ভেবেচিন্তে এ সমস্যার যবনিকা খানিকটা উত্তোলন করতে পার?

থাক, আর লিখব না। তোমাকে চিঠি লিখতে বসে এক নতুন-পাওয়া দাদার কথাই সাতখানা করে লিখছি। চিঠি পড়ে তুমি হয় তো রাগই করছ। মনে মনে বলছ: আচ্ছা অকৃতজ্ঞ তো ছেলেটা। এতকাল আমি চোখের জলে নাকের জলে এক হয়ে কোলে-পিঠে করে মানুষ করলাম। আর কোথাকার কে এক পথে-পাওয়া দাদাকে পেয়ে আমায় পর্যন্ত ভুলতে বসেছে। না দিদি, সে ভয় করো না। তোমাকে কি ভুলতে পারি? তুমি যে আমার দিদি। মা-বাবার আদর-যত্নের কথা ভাল মনে নেই। তুমি যে আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী দিদি। তবু বলছি, আমার এ দাদাকে যদি একবার তোমাকে দেখাতে পারতাম—

চিঠি শেষ না করেই নিজের নাম স্বাক্ষর করেছে সমীর।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে অশ্রুর বুকের ভিতরটা যেন বার বার থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল।

কে এই দাদা ?

কে এমন করে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বুকে তুলে নিয়েছে সমীরকে ?

বাবাকে সে চিনল কোন্ সূত্রে ?

যদি নাই চিনবে তাহলেই বা একটি অপরিচিত মেয়েকে নিয়ে কেন তার এত কৌতূহল ?

তবে কি ?

চকিতেই একটা সম্ভাবনার ক্ষীণ স্বর্ণ-রেখা অশ্রুর মনের দিগন্তকে উদ্ভাসিত করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে দুই আকুল হাতে নিজের দুই চোখ আবরিত করে সে নিজের মনে বলে উঠল : হে ভগবান! তাও কি সম্ভব ? বিসর্জিত দেব-প্রতিমা আজ আবার নব কলেবরে ফিরে আসবে কোন্ মন্ত্র গুণে ?

আর ফিরে এলেই কি তাকে ফিরে পাওয়া যাবে ?

তার আবির্ভাবের সব দুয়ার যে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

সে-অর্গলবদ্ধ দ্বারে বৃথাই কি অশ্রু মাথা কুটে মরবে ?

পর মুহূর্তেই একটা গভীর নৈরাশ্যের কালো-ছায়া নেমে এল তার সারা মুখে।

সে কি পাগল হয়ে গেল নাকি হঠাৎ ?

অর্থহীন কল্পনায় মশগুল এ কী আকাশ-কুসুম সে রচনা করছে ?

আশ্রয়হীন একটি কিশোরের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে একটি দায়র্দ্রচিত্ত মানুষ তাকে আশ্রয় দিয়েছে। সাধারণ মানবিক স্নেহ-বশতঃ তাকে একটু আদরযত্ন করছে। হতে পারে যে ছাত্র হিসাবে বা অন্য কোন সূত্রে বাবার সঙ্গে কোন এক সময়ে তার পরিচয়ও একটু ছিল। এমন তো হতেই পারে।

আর সে কিনা তাকেই কেন্দ্র করে এক অবাস্তব রঙিণ তাসের ঘর গড়ে তুলছে।

হায়রে মানুষের মন!

কত সহজেই সে নিজেকে পর্যন্ত নিজেই প্রতারিত করে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল অশ্রু। এক টুকরো ম্লান হাসি খেলে গেল তার দুই ঠোঁটের ফাঁকে।

পায়ে পায়ে ঘরের ভিতর যেয়ে তখনি কাগজ-কলম নিয়ে বসল সমীরকে চিঠি লিখতে।

সমীর যাহোক একটা কাজ পাওয়াতেই সে যে খুশি হয়েছে সেই কথাটাই লিখল প্রথম। তারপর সান্ত্বনা দিয়ে লিখল, পৃথিবীতে কোন কাজই তো ছোট নয়। কাজকে সার্থক ভাবে সম্পন্ন করার উপরেই তার মর্যাদা নির্ভর করে। ঐ কারখানার কাজের ভিতর দিয়েই ছোট ভাইটি যে একদিন অনেক বড় হবে, এ বিশ্বাস তার আছে। তারপর লিখল সমীরের দাদার কথা। এই প্রসঙ্গে আসতেই কলমের ডগায় অনেক কথাই সহসা ভীড় করে এল। কিন্তু কী এক অজ্ঞাত সংকোচ এসে যেন সে কথার গলা টিপে ধরল। কোন মতে একটা শুকনো কৃতজ্ঞতা জানাবার নির্দেশ ছাড়া কিছুই আর লেখা হল না।

অথচ না লিখেও শেষ পর্যন্ত পারল না। অনেক সংকোচ-সতর্কতার দেয়াল ডিঙিয়ে মনের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পেলই। আশীর্বাদিকা তোমার দিদি লিখে চিঠি শেষ করেও আবার পুনশ্চ দিয়ে লিখল, তোমার দাদার নামটি আমাকে জানিও।

ফেরৎ ডাকেই চিঠি এল সমীরের।

সব সন্দেহের অবসান হল সেই চিঠিতে। দাদার নাম সে লিখে জানিয়েছে। সপদবী পুরো নামই সে লিখেছে।

আরও লিখেছে : জান দিদি, চিঠিতে তুমি দাদার নাম জানতে চেয়েছ একথা বলামাত্রই সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দাদা চিঠিখানা নিল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে চিঠিখানা পড়ল বার কয়েক। কিন্তু হঠাৎ তারপরই শুরু হল সেই ভাবান্তর। একান্ত নিস্পৃহভাবে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা ফেরৎ দিতে দিতে বলল, না না, ও সব নাম-ধাম লিখে আর কি হবে। তুমি বরং লিখে দাও, দাদা দাদা, তার আবার নাম-ধাম-পরিচয়ে কি

হবে ? যেন কতই উদাসীন। ও হরি! আসল ব্যাপার ধরা পড়ল রাতে। কারখানায় সারাদিনের পরিশ্রমের পর আমি তো রাতের খাওয়া সেরে এসেই ঘুমিয়ে পড়ি। অন্যদিন দাদাও এসে শুয়ে পড়ে। দুজনে নানা কথাবার্তা হয়। কাল কিন্তু দাদা শুতে এল না। বলল, তুমি ঘুমিয়ে পড়। আমি একটু বসছি বাইরে। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি দাদা বিছানায় নেই। উঠে বসলাম। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি বাইরের রকে চেয়ার টেনে নিয়ে তখনও বসে আছে দাদা। আর তার হাতে তোমার চিঠিখানা মেলে ধরা। আমাদের রকের নিচেই একটা গ্যাসের আলো আছে। সেই আলোয় তোমার চিঠিখানার দিকে একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে। যেন কোন্ অসীম সৌন্দর্যের আল্পনা আঁকা আছে সে চিঠির পাতায়।

ব্যাপার কি বলতো দিদি ? সত্যি, তিমির বলে কাউকে তুমি চেন নাকি ?

একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অশ্রু। তার দুই চোখ জলে ভরে এল। থর্ থর্ করে কাঁপছে বুকের ভিতরটা। মাথার মধ্যে চলেছে কোন্ ঝড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ।

চিঠিখানা ভাঁজ করে ডান হাতের মুঠোয় সজোরে চেপে ধরে গভীর আবেশে চোখ বুজল অশ্রু। তার মনের পটে দ্রুতগতিতে ভেসে চলল অনেক অতীত স্মৃতির ছায়াছবি।

॥ সাত ॥

মফঃস্বল শহরের সুরকি-ঢালা লাল পথটা ডাইনে একটা বাঁক নিয়ে উধাও হয়ে গেছে কোন্ সুদূর দেশে।

তারই পাশে লোহার তার দিয়ে ঘেরা এক ফালি সবুজ জমি। দুই পাশে দুটো করবী ফুলের গাছ। সবুজ পাতার ফাঁকে অজস্র হলুদ ফুলের সে কী অপরূপ সমারোহ। সবুজে-হলুদে বোনা প্রকৃতির সেই একটুকরো শাড়ির আঁচল অশ্রুর মনে রূপে-রসে আজও মোহ-ময় হয়ে আছে।

সেই আঁচলের আড়ালেই তো তিমিরের সঙ্গে তার প্রথম দেখা।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই সাজিটা হাতে নিয়ে ফুল তুলতে যাওয়া অশ্রুর অনেক দিনের অভ্যাস। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবে একদিন সে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। ফুল তোলার অনেক দিনের অভ্যাস তবু যায় নি।

সেদিনও ঘুম-ভাঙা ভোরে সে হাজির হয়েছিল করবী গাছের তলায়। হাতের কাছে যে কয়টা ফুল ছিল তোলা হয়ে গেল। কিন্তু সাজি তখনও ভরে নি। মাথা উঁচু করে একবার তাকাল গাছের উপরের দিকে। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে গাছের মাথাটা।

কিন্তু ফুলগুলো যে অনেক উঁচু ডালে। তার নাগালের বাইরে। কেমন করে সে তুলবে সেগুলোকে?

একবার ভাবল, আগেকার দিনের মত তর্‌তর্‌ করে উঠে যাবে করবী গাছের ডালে!

পরক্ষণেই সংকোচ এসে বাধা দিল। দুর। যদি কেউ দেখে ফেলে!

ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক বার কয়েক তাকাল। না, কেউ কোথাও নেই। এত ভোরে ঘুম থেকেই ওঠে নি কেউ।

আড়চোখে আর একবার তাকাল করবী গাছটার উঁচু ডালগুলোর দিকে। এক একটা হলুদ ফুল যেন এক একটা মাণিকের মত জ্বল জ্বল করে উঠল। অশ্রুর তুই চোখের মণিতেও জ্বলতে লাগল লোভের মানিক।

চোখ ঘুরিয়ে আর একবার দেখল চারদিকটা। তারপর দ্রুত হাতে শাড়ির আঁচলটাকে গাছ-কোমড় করে জড়িয়ে নিল। মাথার এলোচুলগুলোকে আট করে বেঁধে নিল। ফুলের সাজিটাকে বাঁ হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে করবী গাছটার দো-ডালায় উঠে দাঁড়াল। সেখান থেকে ডান হাত বাড়িয়ে ধরল মাথার উপরকার আর একটা ডাল। সে-ডালটার উপর উঠতে পারলেই অনেক ফুল আসবে তার হাতের নাগালের মধ্যে।

আসলে কিন্তু ফুলগুলো চলে গেল নাগালের আরও বাইরে। হঠাৎ চোখে কেমন যেন অন্ধকার দেখল অশ্রু। হাতের এবং পায়ের তুটো আশ্রয়ই এক সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল।

রাতে হয়তো এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। গাছের ডাল ছিল ভেজা। ডান হাতের ভিতর থেকে ভেজা ডালটা পিছলে সরে গেল। আর নিচের দো-ডালাটার পাশ দিয়ে গড়িয়ে অশ্রু মাটিতে পড়ে গেল। হাত থেকে ছিটকে গেল ফুলের সাজি। সব ফুল ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

মাটি থেকে দো-ডালাটা মোটেই উঁচু নয়। তাই আঘাত বেশী-কিছু লাগে নি কোথাও।

কিন্তু আঘাত লাগল অশ্রুর মনে। আঘাত লাগল তার বুকে। আঘাত লাগল মর্যাদায়।

একটা প্রাণখোলা হাসির ঢেউ এসে তাকে আঘাত করল।

চকিতে কাপড় ঝেরে উঠে দাঁড়িয়েই মুখ ঘুরিয়ে তাকাল অশ্রু।

বেড়ার একটা তার ধরে দাঁড়িয়ে হাসছে একটি তরুণ মানুষ। কত আর বয়স। বড় জোর ষোল সতের। সতেজ সুন্দর গড়ন। বৃষ্টি ভেজা সকাল বেলাকার করবী গাছটার মতই সবুজ সুন্দর। শ্যামল মুখখানিতে দুটি টানা-টানা চোখ। টিকলো নাক। মাথায় কোকড়ানো চুলের রাশি।

বেশ রাগ করেই মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছিল অশ্রু। ভেবেছিল এমন অভব্য হাসির একটা উপযুক্ত জবাব দেবে।

কিন্তু কী যে ছিল বিধাতার মনে। মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াতেই রাগের বরফ গলে গেল। মুখের কঠিন রেখা মৃদু হতে মৃদুতর হল। হতে হতে কখন এক সময় ফিক্ করে এক টুকরো হেসেই ফেলল অশ্রু।

একটু এগিয়ে প্রশ্ন করল, আপনি?

ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলল, আমার নাম তিমির। কলকাতায় হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়ি। ফার্স্ট ইয়ার আর্টস্।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তিমিরের দিকে চেয়ে অশ্রু বলল, তাই নাকি? কিন্তু এখানে কলেজ থাকতে আপনি কলকাতায় হোস্টেলে থাকেন কেন?

মুখ তুলে একটুখানি হেসে ছেলেটি বলল, আপনি দেখছি আমার কোন পরিচয়ই জানেন না। এমন কি পিতৃপরিচয়ও নয়। আমার বাবা শ্রীযুক্ত অধীর প্রসন্ন রায় ডেপুটিকালেক্টর হয়ে সম্প্রতি এই শহরে বদলি হয়ে এসেছেন এবং ওই বাড়িটায় সাময়িক ডেরা ফেলেছেন।

আঙুল বাড়িয়ে পাশের একটা একতলা পাকা বাড়ি দেখিয়ে দিল সে।

ছেলেটার কথা বলবার গম্ভীর ধরন দেখে অশ্রু খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, বুঝেছি বাবা বুঝেছি, আপনিই তাহলে ডেপুটি-বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান তিমির প্রসন্ন রায়। তা সে কথা আগে বলতে হয়।

তিমির বলল, আপনি তো দেখছি আমাকে দেখবার আগেই

আমার ঠিকুজি-কুলজি সব মুখস্ত করে ফেলেছেন, একেবারে রাম না হতেই রামায়ন রচনার মত। কিন্তু পুষ্পোদ্যানে পুষ্পচয়নকারিণী ছাড়া আপনার আর কোন পরিচয় জানবার সৌভাগ্য তো আমার হল না।

আমার পরিচয় অতি সামান্য। দেবার মতন নয় মোটেই। এই যে ছোটখাট বাড়িটা দেখছেন এখানেই আমি থাকি। লেখাপড়া যৎসামান্য। ক্লাস এইট্। আমার বাবা শ্রীযুক্ত অমিয় কান্তি সেন এখানকার স্কুলের শিক্ষক। বলুন, আর কি জানতে চান?

তেমনি মিষ্টি হেসেই তিমির বলল, না, আর কিছু জানতে চাই না। শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই।

বলুন।

যে পরিস্থিতিতে আমাদের সাক্ষাৎকারটি ঘটল তাতে তো আপনার রাগ হবারই কথা। মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথম যখন এ অভাজনের দিকে তাকিয়েছিলেন তখন চোখে যেন বিদ্যুতের আভাষও দেখেছিলাম। কিন্তু পরমুহূর্তেই সহসা সে বিদ্যুৎ-ভরা মেঘ মুখের আকাশ থেকে একেবারে উধাও হয়ে গেল। নীল আকাশের প্রসন্ন দীপ্তিতে হেসে উঠল সারা মুখ। কোন্ মন্ত্রে তা সম্ভব হল বলুন তো?

অপাঙ্গে একবার তিমিরের দিকে তাকাল অশ্রু। ক্ষণেকের জন্য তার মুখমণ্ডল বুঝি লাজরক্তও হয়েছিল একটু।

কিন্তু সে ক্ষণেক মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিস্থ হয়ে অশ্রু পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনি বুঝি কবিতা লেখেন?

তা হয় তো লিখি। কিন্তু সেটা তো আমার প্রশ্নের জবাব হল না অশ্রুদেবী।

জবাব আমি দেব কেমন করে? আপনার প্রশ্নের যে কোন জবাব হয় না তিমিরবাবু।

তিমিরবাবু আর অশ্রু দেবী।

অশ্রু আর তিমির।

চোখের জল আর রাতের আঁধার।

'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে। একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে, কী ছিল বিধাতার মনে।'

তিমিরের প্রশ্নের জবাব যেমন সেদিন অশ্রু দিতে পারে নি, তেমনি খেয়ালী বিধাতার মনে কখন যে কী খেয়ালের উদয় হয় তাও কেউ বলতে পারে না। তবু সেই খেয়ালীর খেয়ালেই বুঝি চলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড।

অশ্রু-তিমিরের অনভিজ্ঞ তরুণ জীবনেও লাগল সেই খেয়ালের অনুকূল হাওয়া। দুটি ভীরু জীবনের তরণী পাশাপাশি চলতে চলতে হঠাৎ এক সময়ে নিজেদের অজ্ঞাতেই বড় বেশী কাছাকাছি এসে পড়ল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা।

অশ্রুদের খোলা বারান্দায় বসেই গল্প করছিল অশ্রু আর তিমির। অশ্রুর বাবা অমিয়বাবু স্কুল থেকে ফিরেই বেরিয়ে গেছেন ছেলে পড়াতে। মা রান্নাঘরে সংসারের কাজে ব্যস্ত।

ধরা গলায় অশ্রু বলল, আর পনেরো দিন পরেই তো তুমি কলকাতা চলে যাবে তিমিরদা।

তা তো যেতেই হবে। কলেজ খুলে যাবে যে।

বারে, আর আমি বুঝি এখানে একা একা থাকব?

একা থাকতে যাবে কেন? তোমার বাবা-মা আছেন। সমীর রয়েছে।

কিন্তু তুমি তো থাকছ না!

থাকছি না। আবার আসব তো। এই তো দু'মাস বাদেই পুজোর ছুটি হবে।

আর ছুটি যতদিন না হবে, তত দিন?

ততদিন কি?

কৃত্রিম রাগের সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে অশ্রু বলল, কিছু না, যাও।

তিমির বলল, তুমি রাগ করলে অশ্রু ?

কোন জবাব দিল না অশ্রু।

অশ্রু।

কোন জবাব নেই।

দুই হাতে আলগোছে তার মাথাটা ধরে মুখটা ঘুরিয়ে দিল তিমির।

ফিক্ করে হেসে ফেলল অশ্রু। হাল্কা গলায় বলল, তুমি আমাকে খুব ভালবাস, না তিমিরদা ?

জানি না তো।

আমি জানি।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁগো মশাই, হ্যাঁ।

পরমুহূর্তেই গলার হাল্কা সুরটাকে ভারী করে অশ্রু ডাকল, তিমিরদা।

বল।

কলকাতা যেয়ে তুমি আমাকে চিঠি লিখবে ?

চিঠি !

হ্যাঁ, চিঠি ! নীল রঙের খামে হলদে রঙের কাগজে।

ভাবী পত্রালাপের সম্ভাবনায় যেন উল্লসিত হয়ে উঠল তিমির। বলল, বাঃ, বেশ বলেছ তুমি। সে কিন্তু খুব ভাল হয়।

পরম বিজ্ঞের মত অশ্রু বলল, তুমি তো বললে খুব ভাল হয়। কিন্তু যদি বাবা-মা টের পান, তখন ?

তিমিরের মনের উৎসাহের আগুন যেমন দপ করে জ্বলে উঠেছিল তেমনি খপ্ করে নিভে গেল। ম্লান গলায় সে বলল, তাইতো, তাহলে কি হবে ?

খুব গম্ভীর হয়ে একটুক্ষণ কি যেন ভাবল অশ্রু। তারপর ডান

হাতের তর্জনীটা তিমিরের মুখের কাছে নাড়তে নাড়তে বলল, ঠিক হয়েছে। একটা খুব ভাল প্ল্যান এসেছে আমার মাথায়।

কি রকম ?

ধরো, আমরা দুজনই যদি নামটা পাল্টে নেই।

মানে ?

ধরো, তুমিও তিমির নও, আমিও অশ্রু নই। অন্য নামে যদি আমরা চিঠি লেখালেখি করি।

তাতে কি হবে ?

বাঃ, তাও বুঝতে পারলে না ? আরে, তাহলে সে সব চিঠি বাবা-মার হাতে পড়লেও তাঁরা আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন না। বলে দিলেই হবে যে আমার সইয়ের চিঠি। আবার তুমিও হোস্টেলের ছেলেদের কাছে সেই রকম একটা গল্প চালিয়ে দিতে পারবে। কেমন, খুব মজা হবে না ?

একটা নিঃশ্বাস ফেলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তিমির। হেসে বলল, বাব্‌বা, এত ফন্দিও ঢোকে তোমার মাথায়। সত্যি, তুমি খুব বুদ্ধিমতী অশ্রু।

স্বীকার করছ তাহলে ?

নিশ্চয়। একশো বার স্বীকার করছি।

তা তো হল। এখন নাম রাখার কি করা যায় বলতো ? ধরো, আমার নামটা কি হলে ভাল হয় ?

কি হলে ভাল হয় তার আমি কি জানি ? তুমিই বলো না।

সবই যদি আমি করব, তাহলে তুমি করবেটা কি শুনি ?

কেন ? তোমার সেই নতুন নাম ধরে তোমাকে আমি কানে কানে ডাকব।

উঃ, কী আমার করিৎকর্মা পুরুষরে! আমি রেঁধে বেড়ে তৈরি করে দেব, আর উনি বসে বসে গিলবেন।

সহসা কথার পিঠে একটা লাগসই কথা বলবার সুযোগ পেয়ে

তিমির হো হো করে হেসে উঠল। বলল, সত্যি বলছ, তুমি আমাকে রেঁধে বেড়ে খাওয়াবে? সত্যি?

লজ্জায় অশ্রুর মুখখানা আরক্তিম হয়ে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে সে বলল, ধ্যেৎ, তাই বুঝি বলেছি আমি! ওতো একটা কথার কথা।

করুণ গলায় তিমির বলল, কেন অশ্রু, কথার কথা কেন? এ কথা কি সত্যি হতে পারে না আমাদের জীবনে?

তুমি ঠিক বলছ তিমিরদা?

তোমাকে কি বেঠিক কথা বলতে পারি? কল্পনা করো তো—সারা দিন খেটেখুটে আমি জোগাড় করে আনব খুদ-কুড়ো। আর তাই দিয়ে তুমি রান্না করবে পরমান্ন। কী যে তৃপ্তিতে সে অন্ন আমি গ্রহণ করব!

গভীর আবেগে কথাগুলো বলল তিমির। আর মোহমুগ্ধ কুরঙ্গীর মত দুই বিস্ফারিত চোখ মেলে সে কথা শুনল অশ্রু।

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেল অশ্রু। তিমিরকে বাধা দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল, এই! কী যা তা বলছ? কেউ শুনে ফেলবে।

বাধা-দেওয়া ডান হাতখানাকে দুই হাতে চেপে ধরে তিমির ডাকল, অশ্রু!

ধ্যেৎ—বলে অশ্রু উঠে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। হতভম্বের মত তার গমন-পথের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিমির।

সেদিনকার মত বন্ধ থাকলেও পত্রালাপের উপযোগী নামকরণ পর্ব সমাধা করতে তাদের অধিক বিলম্ব হল না।

যার-যার নিজের নাম সে নিজেই আবিষ্কার করল।

অশ্রু বলল, ধরো, আমি যদি আমার সখার সঙ্গে 'চোখের জল' পাতাই, তাহলে কেমন হয়?

তিমির আপত্তি জানাল, মোটেই ভাল হয় না। গোড়াতেই আমি কাঁদতে বসব কোন্ দুঃখে শুনি?

বাঃ, এই না হলে আর বুদ্ধি। শুধু কাঁদলেই বুঝি চোখের জল পড়ে? হাসলে পড়ে না? এত কবিতা লিখতে পার আর 'আনন্দাশ্রু' কথাটাও কি শোন নি?

হার মানছি। হার মানলাম। বেশ, ওই চোখের জলই মঞ্জুর। কিন্তু তাহলে আমার সখীর সঙ্গে আমি কি পাতাব জান?

কি?

'রাতের আঁধার'।

ধ্যেৎ। সেই আঁধারে বুঝি আমি পথ হারিয়ে ঘুরে মরব?

ইস্, এই না হলে আর বুদ্ধি। আরে বাবা, আঁধারে পথ কি শুধু হারিয়েই যায়? আঁধারের বুকে নতুন করে সূর্য ওঠে না? সবুজ পথ ঝিলমিল করে হাসে না?

আমিও হার মানছি। হার মানলাম। কেমন হল গো? মঞ্জুর—মঞ্জুর—ওই 'রাতের আঁধার'ই মঞ্জুর।

বলেই তিমির গুন গুন করে আবৃত্তি করল রবি ঠাকুরের এক লাইন কবিতা : 'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?'

তারপর দুজনেই চুপ। হারিয়ে গেল সব কথা। নীরব হল সব ভাষা।

একখানি হাত শুধু বাঁধা রইল আর একখানি হাতে। বড় কাছাকাছি বুঝি সরে এল থর-থর কাঁপা দুটি মন।

দুটি মনের নিভৃত আঙিণায় আঁকা পড়ল অনেক আশার আল্পনা।

দুটি মনের আকাশে রঙ ছড়াল অনেক আলোর ফুলঝুরি।

॥ আট ॥

কারখানায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমীর।

কতকগুলি বিভক্ত খণ্ড এক করে এক বিশেষ উপায়ে সেগুলিকে সংযোজিত করলেই সেটা একটা সজীব যন্ত্রে পরিণত হয়।

বড় একটা লৌহপিণ্ড যখন প্রাণবান হয়ে মানুষের চেয়ে অনেক বেশী বড় হয়ে ওঠে, সমীর তখন যন্ত্র-দেবতার অসীম শক্তির পায়ে মাথা নত করে।

মানুষ শত চেষ্টায়ও যে কাজ করতে পারে না, যন্ত্র-দেবতার অঙ্গুলি চালনেই তা অনায়াসে সম্পন্ন হয়—সমীর একাগ্রচিত্তে এই শক্তির খেলা দেখে, আর নিত্য নতুন শক্তির উদ্ভাবনের আকুল আবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এমনি প্রাণঢালা প্রচেষ্টায় নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা সমীরের জন্মাল। যে কাজে সে হাত দেয়, সার্থকতা সেই পথেই তার কপালে জয়টীকা এঁকে দেয়। ভাগ্যাকাশে তার একদাশ বৃহস্পতির উজ্জ্বল অবস্থান। উন্নতি তার হবেই।

কাজে কাজে সে ব্যস্ত থাকে। মনের আঁধার গুহায় অজানা বিদ্যুৎ চকিতে ঝলসে ওঠে। সব কাজ ফেলে সমীর সেই নতুন সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে মেতে ওঠে। এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশ জুড়ে দেয়। ক্রমে তার মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপ পায়। আনন্দে সে যন্ত্র-দেবতার পূজা করে নিভৃত অন্তরে।

কারখানা থেকে ফিরতে আজকাল প্রায়ই বেশ একটু রাত হয়ে যায় সমীরের। নিজের ডিউটির সময় ছাড়াও নানান টুকিটাকি কাজ নিয়ে সে অনেক সময় কাটিয়ে দেয় কারখানায়। কারখানাটা যেন তার সমস্ত সত্তাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে।

দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায়, কখন রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসে চারধারে, সমীরের খেয়ালই থাকে না। নিজের কাজের মধ্যে সে একেবারে ডুবে যায়।

প্রথম প্রথম কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরবার সময় তিমির তাকে ডাকতে আসত তাদের ডিপার্টমেন্টে। কিন্তু এসে প্রায়ই দেখত, নিজের ডিউটির কাজ শেষ করে অন্য একটা বাড়তি কাজ নিয়ে সে তন্ময় হয়ে আছে। কখনও বা দেখত একটা চলমান বিরাট মেসিনের ঘর্ঘর গর্জনে কান পেতে হাঁ করে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

সমীরের সেই যন্ত্র-স্বপ্নকে আচমকা ডেকে ভেঙে দিতে মন চাইত না তিমিরের। তাই নিঃশব্দেই সে সরে যেত সেখান থেকে। একাই বাসায় ফিরত।

সেই থেকে এখন আর তিমির সমীরকে ডাকতে যায় না কাজের পরে। সোজা বাসায় ফিরে যায় একা। নির্জন ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকে।

কখনও বা খোলা রকটায় চেয়ার টেনে নিয়ে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারি মধ্যে একটা উজ্জ্বল তারা কি সজল চোখে চেয়ে থাকে তার দিকে?

সেদিনও বেশ রাত করেই কারখানা থেকে ফিরল সমীর।

তিমির ঘরেই ছিল। শুয়ে ছিল। সমীরকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে বসল।

হাসিমুখে বলল, যন্ত্র-দেবতার পূজা শেষ হল?

সমীর লজ্জিত ভাবে বলল, সত্যি, বড্ড দেরী হয়ে গেছে দাদা। তোমার হয় তো খেতে আজ দেরীই করে ফেললাম।

না না, তাতে কি হয়েছে। খেতে না হয় একদিন একটু দেরী

হলই। সে জন্য তোমাকে অতটা 'কিন্তু' হতে হবে না। তবে কি জান, যন্ত্র-দেবতার প্রতি বড্ড বেশী ঝুঁকে পড়েছ তুমি। ফলে আর কারও কথা ভাববার বা আর কারও দিকে নজর দেবার তোমার যে সময়ই হচ্ছে না।

তিমিরের গলার স্বরটা যেন একটু গম্ভীর-গম্ভীর। কেমন যেন একটা অপরাধ-বোধ হঠাৎ সমীরের মনকে ঘিরে ধরল।

সত্যি তো, একান্ত অপরিচিত অনাত্মীয় এই মানুষটি পথ থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে আশ্রয় দিয়েছে। স্নেহে যত্নে ভালবাসায় একেবারে আপন ভাইয়ের মত করে রেখেছে। অথচ নিজের কাজ নিয়ে স্বার্থপরের মত সে এতই ডুবে আছে যে তাঁর সুখ-সুবিধার প্রতি এতটুকু নজরও সে দিচ্ছে না, প্রতিদানে কিছু দেওয়া তো দূরে থাক। নাঃ, এ তার সত্যি খুব অন্যায় হয়েছে।

ভীরু মুখ তুলে তিমিরের দিকে তাকাল সমীর। বলল, তুমি আমাকে মাপ কর দাদা, আর কখনও এ রকম হবে না।

হো-হো করে হেসে উঠল তিমির। বলল, ও হরি, এতদিন কাছে থেকে এই তুমি দাদাকে চিনলে। নিজের কাজে তুমি মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছ, তার ফলে তোমার জীবনে আসবে সাফল্য, আসবে সার্থকতা, আর তাতে আমি তোমার উপর বিরক্ত হব, বিরূপ হব? নারে ভাই, আর যাই হই, অতটা স্বার্থপর আমি নই।

স্বার্থপর যে তিমির নয় সে কথা সমীরের চেয়ে আর বেশী করে কে বুঝেছে? কিন্তু তাহলে তার ওই একটু ক্ষণ আগেকার কথাগুলোর মানে কি? অন্যের প্রতি সমীর উদাসীন, এ অভিযোগের কারণ কি তাহলে? কি বলতে চায় তিমির?

কোন কিছুই না বুঝতে পেরে বোকার মত তিমিরের মুখের দিকেই তাকিয়ে রইল সমীর।

তিমির বলল, আমি বলছিলাম তোমার দিদির কথা।

যেন আকাশ থেকে পড়ল সমীর। সবিস্ময়ে বলল, দিদির কথা? কি হয়েছে দিদির?

তোমার দিদির কিছুই হয় নি। ভালই আছে।

তাহলে?

আমি বলছিলাম, মামা-মামীর ভয়ে তুমি তো পালিয়ে এসে এখানে ডেরা বাঁধলে, কিন্তু সেখানে তোমার দিদির যে কি হাল হচ্ছে সে কথা কি একবারও ভাবছ না?

ভাবছি দাদা, খুবই ভাবছি। কিন্তু কি করব বল? ভেবে তো কূল-কিনারা কিছুই করতে পারছি না।

একটু চুপ করে থেকে তিমির বলল, এখানে একটা ছোটখাট বাসা করে তোমার দিদিকে কেন নিয়ে আস না?

এখানে এনে দিদিকে কোথায় রাখব বল? টাকা যা পাই সপ্তাহে, তাতে বস্তির একখানা নোংরা ঘরের ব্যবস্থা হয় তো কোন মতে হতে পারে। তার মধ্যে দিদিকে এনে তুলব কেমন করে?

হুঁ, তুমি যা বলছ তাও মিথ্যে নয়। বস্তির পরিবেশে এসে থাকতে তার খুবই কষ্ট হবে। তবু আমার মনে হয় সেখানে সে যে কষ্ট ভোগ করছে তার চেয়ে এই ব্যবস্থাই ভাল। বাইরের অসুবিধা এখানে যতই থাক, মনের শান্তি তো পাবে। বিশেষ এখানে তুমি কাছে থাকবে।

তিমিরের কথাগুলো শুনতে শুনতে হঠাৎ প্রশ্ন করল সমীর, আচ্ছা দাদা, অনেক দিন তোমার কাছে আছি, দিদির কথা তো বড় একটা তোমার মুখে শুনি নি। আজ হঠাৎ তার কথা তোমার মনে এল কেন?

মনে এল কারণ আজ ডাকে তার একখানা চিঠি এসেছে। এই নাও।

বালিশের তলা থেকে হাত বাড়িয়ে পোস্টকার্ডের চিঠিখানা সমীরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, তোমার চিঠি বলেই কৌতূহল

বশতঃ চিঠিখানা আমি পড়ে ফেলেছি। কিছু মনে করো না।

না না, আমার চিঠি তুমি পড়বে তার আবার মনে করবার কি আছে?

চিঠিখানা পড়ল সমীর।

অশ্রু বার বার তাকে অনুরোধ জানিয়েছে, যত শীঘ্র সম্ভব তাকে কলকাতায় নিয়ে আসতে। সমীর যখন যাহোক একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে তখন যেমন করে হোক ছুটি ভাই-বোনের দিন এক রকম চলেই যাবে।

চিঠি থেকে মুখ তুলে সমীর বলল, তাই তো দাদা, চিঠি পড়ে তো মনে হচ্ছে দিদি সেখানে খুবই কষ্টে আছে। তাকে তো এবার এখানে না আনলেই নয়।

আমিও তো সেই কথাই বলছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে সমীর আবার বলল, একটা কথা বলব দাদা?

বল।

কথাটা অবশ্যি এর আগেও তোমাকে বলেছি। তবু নিরুপায় হয়েই আবার বলছি।

বলই না কি বলতে চাও। এত ভূমিকা করছ কেন?

দেখ দাদা, বাসার চেষ্টা আমি দেখতে পারি যদি তুমি অভয় দাও।

আমি?

হ্যাঁ তুমি। তুমি হ্যাঁ বললেই সমস্যাটার সমাধান হয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গেই গলার স্বর পাল্টে গেল তিমিরের। গম্ভীর গলায় বলল, তার মানে তুমি বলতে চাও আমাকেও তোমাদের ভাই-বোনের সংসারের অংশীদার হয়ে সেখানে থাকতে হবে, এই তো?

সমীর ভয়ে ভয়ে বলল, অবশ্য কথাটা স্বার্থপরের মতই শোনাবে, তবু বলছি দাদা, তুমি আপত্তি করো না। তোমার মত পেলেই আমি কাজে লেগে যাই।

সংযত অথচ দৃঢ় গলায় তিমির বলল, তা হয় না ভাই, তা সম্ভব নয়।

সমীর একটু অসহিষ্ণু ভাবে বলল, কিন্তু কেন হয় না, কেন সম্ভব নয় সেইটেই তো আমি বুঝতে পারছি না। তোমার যোগ্য সম্মান আমরা দিতে পারব না এই কি তোমার ভয়?

প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে তিমির বলল, ভয় যে আমার কোথায় এবং কিসের সে কথা তোমাকে আজ আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না ভাই। শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে তুমি যা বলতে চাইছ আমার পক্ষে তাতে সম্মত হওয়া সম্ভব নয়।

এই দৃঢ় স্পষ্ট জবাবের পরে আর কোন কথাই চলে না। সমীরও এ নিয়ে আর কথা বাড়াল না। শুধু অবাক হয়ে এই অতি কাছের অথচ দূরের মানুষটির কথাই ভাবতে লাগল।

স্কুলের বইতে সে পড়েছিল, মহাপুরুষদের চরিত্র হয় মৃদুনি কুসুমাদপি বজ্রাদপি কঠোরানি। মহাপুরুষ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারনা তার নেই। তবু সেই মুহূর্তে তিমিরের গম্ভীর নিস্পৃহ মূর্তির দিকে তাকিয়ে সমীরের বার বার মনে হতে লাগল, তাঁদের চেহারার আদল বোধ হয় সেখানে আছে। স্নেহে ও করুণায় বিগলিত, অথচ স্বধর্মে অটল অবিচল।

ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ আর একটি প্রশ্ন সমীরের মনে জাগল।

প্রশ্নটা এর আগেও আরও অনেক দিন তার মনকে আলোড়িত করেছে। কিন্তু বলি-বলি করেও কিছুতেই তিমিরকে প্রশ্নটা সে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি। একটা সংকোচ এসে বার বার তার মুখ আটকে ধরেছে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সমীরের মনে হল যেন এই মানুষটি অন্য সকলের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষকে মাপবার মাপ-কাঠি দিয়ে একে মাপা যায় না।

তাই তার মনে হল, এই নিস্পৃহ উদাসীন মানুষটিকে বুঝি তার

মনে অনেকবার উঁকি-দেওয়া প্রশ্নটা অসংকোচেই করা যায়।

তিমিরের গম্ভীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সমীর বলল, আচ্ছা দাদা, আর একটা প্রশ্ন তোমাকে করব ?

কর।

আচ্ছা, তুমি আমার বাবাকে চিনতে ?

প্রশ্নটা শুনেই চমকে উঠল তিমির। বলল, কেন ? এ-কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন ?

দেখ দাদা, কিছু দিন থেকেই আমার মন বলছে কোথায় যেন আমাদের পরিবারের সঙ্গে তোমার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। তুমি আমার বাবাকে চিনতে। এমন কি আমার দিদিকেও।

সমীর !

যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি তুমি আমাকে ক্ষমা কর দাদা।

না ভাই, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, ঠিকই ধরেছ। সত্যি বলেছ, তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমি চিনি। তোমার বাবা, মা, দিদি, এমন কি তোমাকে পর্যন্ত।

তিমিরের আবেগবিহ্বল কণ্ঠস্বর যেন নতুন করে সাহস জোগাল সমীরের মনে। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, তবে—তবে কেন তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে অমত করছ দাদা ?

বলেছি তো সমীর সে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব ও আলোচনা থাক। কলকাতায় বাসা তুমি কর। দিদিকে এখানে নিয়ে এস। তাতে আমি খুব খুশি হব। শুধু এ ব্যাপারে আমার কোন সহায়তা তুমি চেও না। আমি অক্ষম।

অবাক বিস্ময়ে আর একবার তিমিরের অচঞ্চল পাষাণমূর্তির দিকে তাকাল সমীর।

এই মানুষটির কণ্ঠস্বরই কি একটু আগে এমন আবেগবিহ্বল হয়ে উঠেছিল ?

এই মানুষটিই কি একদিন মায়ের অধিক মমতায় তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল নির্মম মহানগরীর ফুটপাথ থেকে ?

দু'জনেই চুপচাপ বসে রইল পার্কের কোণের সেই ছোট নির্জন ঘরটাতে।

বাইরে গভীর হতে গভীরতর হতে লাগল কলকাতার রাত।

এক সময়ে সমীরের চমক ভাঙল তিমিরের ডাকে।

এইবার খেতে চল ভাই। এর পরে হোটেলের দরজা যে বন্ধ হয়ে যাবে।

চল।

নীরবেই পথ অতিক্রম করে দুজনে হোটেলে পৌঁছুল। নীরবেই সমাধা করল রাতের আহার পাশাপাশি বসে। আবার নীরবেই ফিরে এল ঘরে।

ঘরে ঢুকেই বিছানায় শুয়ে চোখ বুঁজল সমীর।

তবু ঘুম এল না তার চোখে।

একদিকে তিমির আর একদিকে অশ্রু। এই দুইয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা সেতু রচনার অক্ষম চেষ্টায় সে তার কল্পনার 'গিয়ারে' ডবল চাপ দিয়েও কোন কূল-কিনারা করতে পারল না কিছুতেই।

আর তিমির।

সেদিনও চেয়ারটা টেনে নিয়ে বাইরের রকে বসল সে। দুই চোখ বুঁজে নিশ্চুপ হয়ে রইল ধ্যানমগ্ন ঋষির মত।

বাইরের আকাশে অনেক তারার মালা।

কিন্তু তিমিরের মনের আকাশে শুধু একটিমাত্র ক্ষীণ আশার আলোর কচিৎ কনকদীপ্তি।

কলকাতা আসবার জন্য অশ্রুর মনে এত অধীর ব্যাকুলতা কেন ? সে কি শুধুই ছোট ভাইটির আকর্ষণ ? না, তার বেশী কিছু ?

রাতের আঁধার কি ডাক দিয়েছে চোখের জলকে ?

চোখের জল কি তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে ?

এস চোখের জল, এস। রাতের আঁধারের বুকে লাগুক ত্বিষাম্পতির রক্তিম শিহরণ।

নিজের অজ্ঞাতেই ডান হাতখানি তুলে ছুটি চোখ মুছল তিমির।

সে কি বেদনার আঁখিজল না পুলকাশ্রু ?

॥ নয় ॥

সমীর-তিমিরের অনেক কথাকাটাকটিতেও সেদিন যে সমস্যার কোন মীমাংশা কিছুতেই হল না, আর একদিন একটা অনুকূল ঘটনার ভিতর দিয়ে কত সহজেই সে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

শুধু যে সমাধান হয়ে গেল তাই নয়, সেই ঘটনার সূত্র ধরে আর একটি জটিলতর সমস্যার গ্রন্থি বুঝি জট পাকিয়ে উঠল।

সমীরের পরিচয় ঘটল কারখানার ছোট সাহেবের মেয়ে মলি মজুমদারের সঙ্গে। আর সেই পরিচয়ই একদিন সমীর আর অশ্রুর জীবনে ডেকে আনল এক দারুণ দুর্দৈব।

কিন্তু সে কথা এখন থাক।

কিছুদিন যাবৎই একটা নতুন ধরনের মাইক্রোফোন যন্ত্র তৈরীর নেশায় যেন সমীরকে একেবারে পেয়ে বসেছিল।

যন্ত্রটি হবে প্রচলিত অনুরূপ যন্ত্রের চেয়ে আকারে অনেক ছোট। তার যান্ত্রিক গঠনপদ্ধতি হবে সরলতর। প্রয়োগ-রীতিও হবে সহজসাধ্য। তাছাড়া যন্ত্রটি নির্মানের আনুপাতিক ব্যয়ও হবে অনেকাংশে কম।

দিনের পর দিন অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে তার এই নব-উদ্ভাবিত যন্ত্রটিকে নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে।

এতদিনে বুঝি সফল হবে তার সব সাধনা, অবিচল অধ্যবসায়। যন্ত্রটির যে পরিকল্পিত রূপ ছিল তার মনে এতদিনে যেন সেটা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আনন্দে ও আশংকায় ক্ষণে ক্ষণে আলোড়িত হয়ে উঠছে তার বুকের রক্ত।

কথায় কথায় একদিন তিমিরকে তার এই উদ্ভাবনের কথাটি খুলে বলল সমীর।

দেখ দাদা, আমার মনে হচ্ছে যে মাইক্রোফোন যন্ত্রটা আমি তৈরি করেছি তার একটা বিরাট কমার্শিয়াল সম্ভাবনা আছে। কারখানার মালিক পক্ষের কাউকে যদি সব ব্যাপারটা বোঝানো যায় তাহলে হয়তো আমার এতদিনের চেষ্টার একটা হিল্লে হতে পারে।

তিমির বলল, তুমি ঠিক বলছ যে ম্যানুফ্যাক্‌চারিং স্কেলে যন্ত্রটাকে বাজারে ছাড়তে পারলে কোম্পানি একটা রেডি মার্কেট পাবে?

অভিমানক্ষুব্ধ গলায় সমীর বলল, আমার কথা হয় তো আজ তোমরা বিশ্বাস করতে পারছ না দাদা, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ যন্ত্র বাজারে চালু হবেই।

একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে তিমির বলল, তাহলে দেখি চেষ্টা করে কতদূর কি করতে পারি।

সমীর সাগ্রহে বলল, আমার মন বলছে দাদা, তুমি একটু চেষ্টা করলেই হবে। কারখানার ছোট সাহেবের সঙ্গে তোমার বেশ জানাশোনা আছে। তাঁকে বলেই তো আমার চাকরিটা করে দিয়েছ। একবার তাকেই বুঝিয়ে বল না ব্যাপারটা। যদি বল, না হয় আমিও তোমার সঙ্গে থাকতে পারি।

তিমির হেসে বলল, তোমাকে তো সঙ্গে থাকতেই হবে। নইলে আমি ও সবের কি বুঝি বল? তবে সে এখুনি নয়। মজুমদার সাহেবের সঙ্গে আমি আগে কথা বলে দেখি, ব্যাপারটাকে তিনি কি ভাবে নেন, তারপর গতিক ভাল বুঝলে তোমাকে নিয়ে যাব তাঁর কাছে।

সমীর তিমিরের হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল, তাই করো দাদা, তাই করো। শুনেছি কোম্পানীর মালিকদের উপর ছোট সাহেবের খুব প্রভাব। তিনি যদি একটু মুখ তুলে তাকান—

আস্তে নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে তিমির বলল, তুমি এতটা

উতলা হয়ো না সমীর, ভাগ্যের উপরে কারও কিছু করবার নেই।

নিরাশার সুরে সমীর বলল, তুমিও ভাগ্যের দোহাই দিচ্ছ দাদা?

চমকে তিমির বলল, আমিও মানে? আর কারও সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছ নাকি এর আগে?

না না, আমি বলছি আমার দিদির কথা।

ওঃ তাই বলো। তা, কি বলে তোমার দিদি?

ওই একই কথা। ভাগ্যে যা আছে তাই তো হবে, তার উপরে তো আর মানুষের কোন হাত নেই।

হেসে তিমির বলল, তোমার দিদি ঠিকই বলেছে। পৃথিবীটাকে আজও তুমি ভাল করে দেখ নি ভাই, তাই আত্মশক্তির উপর আজও তোমার অটুট বিশ্বাস আছে। কিন্তু পৃথিবীটাকে যখন আরও কাছাকাছি, আরও মুখোমুখি দেখবার সুযোগ পাবে তখন বুঝতে পারবে ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রম্। যতই গলা ফাটাও আর হাত-পা আকাশে ছোড়, শেষ পর্যন্ত ওই আকাশের ওপারের একখানা অদেখা হাত যেদিকে আঙুল হেলাবে রথ তোমার সেদিকেই ছুটবে। হাজার উল্টো ঘুরিয়েও সে গতি থামাতে বা ফেরাতে পারবে না।

মুখ তুলে কি যেন বলতে যাচ্ছিল সমীর, তাকে বাধা দিয়ে তিমির আবার বলল, আমি জানি এসব কথা আজ তোমার ভাল লাগবে না। তাছাড়া এ তর্কের কোন শেষও নেই। তর্কে আমাদের দরকাই বা কি? তুমি ভুলে যেয়ো না সমীর যে তুমি আমার ভাই। দাদা বলে যখন ডেকেছ, তখন দাদার পক্ষে তোমার জন্য যেটুকু করা সম্ভব তার অন্যথা হবে না।

শ্রদ্ধাপ্লুত গলায় সমীর বলল, সে আমি জানি দাদা।

সমীর ঠিকই বলেছিল।

চেষ্টার ক্রটি তিমির করে নি। আর সে চেষ্টা ফলবতীও হল। তিমিরের মুখে সব কথা শুনে ছোটসাহেব মিঃ মজুমদার সত্যি

কৌতূহলী হয়ে উঠলেন সমীরের নতুন মাইক্রোফোন যন্ত্রটা দেখবার জন্য।

তিমিরই তার পরদিন সমীরকে সঙ্গে করে মিঃ মজুমদারের ঘরে ঢুকল।

বিশেষ মনোযোগ দিয়েই তিনি সমীরের সব কথা শুনলেন। প্রীত হলেন। সমীরের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা আর মার্জিত আলাপে তার প্রতি আকৃষ্টও হলেন অনেকখানি।

সোৎসাহে বললেন, ইয়েস ইয়ং ম্যান, ইউ ক্যান রিলাই অন্ মাই পেট্রনেজ্। তোমার উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখে আমি ভারি খুশি হয়েছি। আমার পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব আমি নিশ্চয় করব।

করলেনও।

কোম্পানীর মালিক-পক্ষ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের একটা সভা ডাকলেন তিনি।

আর সেই সভাতেই সমীরের নতুন মাইক্রোফোন যন্ত্রটার একটা প্রাথমিক ডেমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থাও করলেন।

সভার গতানুগতিক কাজকর্ম অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। তারপরই ডাক পড়ল সমীরের।

তার নব-উদ্ভাবিত যন্ত্রটি আগে থেকেই সভা কক্ষের এক কোণে একটা টেবিলের উপরে বসানো ছিল। সমীর আর তিমির উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করছিল বাইরে।

ডাক আসতেই ভীরু চোখ তুলে তিমিরের দিকে তাকাল সমীর। তার বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন যেন খালি-খালি লাগতে লাগল। মনে হতে লাগল, মাথার ভিতরে একটা বোবা আওয়াজ ছাড়া আর যেন কিছুই নেই।

সস্নেহে তার পিঠে একটা চাপ দিয়ে তিমির বলল, কোন ভয় নেই ভাই, তোমার ডেমনস্ট্রেশন দেখে ওরা নিশ্চয় খুশি হবেন। মনে বেশ জোর নিয়ে ভিতরে চলে যাও।

নিচু হয়ে তিমিরকে একটা প্রণাম করে তুরু তুরু বুকে সুইং-ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল সমীর।

প্রথমেই তাকে সরবে অভ্যর্থনা করলেন ছোট সাহেব। বললেন, আসুন মিঃ সেন, আসুন। আপনার আবিষ্কৃত মাইক্রোফোনের অপারেশনটা এঁদের সবাইকে একবার ভাল করে দেখিয়ে-শুনিয়ে দিন।

মিঃ সেন! আসুন!

চমকে মুখ তুলে একবার তাকাল সমীর। ছোট সাহেব কি তাকে পরিহাস করছেন? কারখানার একজন নগণ্য মজুরের এই দুঃসাহসিক স্পর্দ্ধাকে কি ব্যঙ্গ করছেন তিনি?

সমীরের পায়ের নিচে মাটি যেন কাঁপতে লাগল।

আবার কথা বললেন ছোট সাহেব, এ অবস্থায় একটু নার্ভাস্ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি কোন রকম সংকোচ করবেন না মিঃ সেন। এঁরা সবাই আপনার শুভাকাঙ্খী। আপনি নির্ভয়ে আপনার কাজে হাত দিন।

ছোট সাহেবের গলার দরদী স্বরে শংকা দূর হল সমীরের মন থেকে। সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেলে একবার সে তাঁকাল তাঁর দিকে।

চোখের ইসারায় সমীরকে উৎসাহ দিয়ে তিনি বললেন, ইয়েস্ ইয়ং ম্যান, প্রসীড্। আমরা সকলেই তোমার সাক্‌সেস্ কামনা করছি।

ধীর পায়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল সমীর। কালো কাপড়ের ঢাক্‌নাটা তুলে যন্ত্রটা বের করল।

বুক কাঁপছে তার। হাত কাঁপছে। সারা শরীর কাঁপছে।

সেই অবস্থায়ই একের পর এক পূর্ব-পরিকল্পনা অনুয়ায়ী কাজ করে চলল সে।

ধীরে ধীরে তার বুক শান্ত হল। হাত সাবলীল হল। শুষ্কপ্রায় কণ্ঠনালি হতে উৎসারিত হতে লাগল কথার প্রবাহ।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে একটানা কাজ করে ও কথা বলে সমীর শেষ করল তার ডেমনস্ট্রেশন। দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, আমার যেটুকু দেখাবার বা বলবার তা এখানেই শেষ হল। এখন এর ভবিষ্যৎ আপনাদের হাতে। নমস্কার।

সঙ্গে সঙ্গে সমীরকে বিস্মিত করে দিয়ে প্রায় একই সঙ্গে করতালি দিয়ে উঠল সমবেত সকলে।

সেই করতালির তালে তালে বুঝি নেচে উঠল সমীরেরও মন।

আশা-আশংকায় দোলায়িত চিত্তে আর একবার সে তাকাল সকলের মুখের দিকে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন কোম্পানীর চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ সোম। নানা ভাবে নানা দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন যন্ত্রটাকে! নানা অংশকে খুললেন ও জুড়লেন। নানা রকম প্রশ্ন করলেন সমীরকে। কিছু আলোচনাও করলেন টুকরো টুকরো ভাবে।

খুশি হয়ে সমীরের পিঠে কয়েকটা চাপড় দিয়ে বললেন, ব্র্যাভো ইয়ং মেকানিক, ব্র্যাভো। তোমার কাজটা সত্যি খুব ইন্টারেষ্টিং হয়েছে।

মালিক পক্ষের একজন প্রশ্ন করলেন, আপনার কি মনে হয় মিঃ সোম, কোম্পানী এ-কাজটাকে হাতে নিতে পারে?

মিঃ সোম বললেন, মেকানিক্যাল সাইডটা যতটা দেখলাম তাতে তো মনে হচ্ছে কোম্পানী এ-কাজে হাত দিলে বেশ লাভবানই হবে। তবে এর প্র্যাকটিক্যাল সাইডটা তো এখনও দেখা হয় নি।

মালিক প্রশ্ন করলেন, প্র্যাকটিকাল সাইড মানে?

মানে যন্ত্রটার সঙ্গে গলা মিশিয়ে তো দেখা হয় নি তার এফেক্টটা কি রকম দাঁড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গে ছোট সাহেব মিঃ মজুমদার বলে উঠলেন, বেশ তো আমাদের মধ্যে যে কেউ একজন ওই মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে

একটা ভাষণ দিলেই তো সে পরীক্ষাটা হয়ে যায়। কি বলেন স্যার আপনারা?

মালিক পক্ষের একজন বললেন, হ্যাঁ, তা তো হয়ই। তবে আর একটা কাজ করলে হয় না?

কি কাজ বলুন?

আপনার মেয়েকে তো দেখলাম আপিসের সামনে গাড়িতে বসে আছে।

হ্যাঁ, ফিরবার পথে একটু মার্কেটটা হয়ে যাবে, তাই মলি আমার সঙ্গেই এসেছে।

মলি তো শুনেছি বেশ ভাল গায়।

তা মাঝে মাঝে ফাংশনে মলি আজকাল ভালই গাইছে।

তাহলে মলি মাকেই ডেকে আনুন না কেন? মিঃ সেনের ডেমন্‌-স্ট্রেশনও হবে আবার আমাদেরও সেই ফাঁকে একটা গান শোনা হয়ে যাবে।

সেই ব্যবস্থাই হল।

মালিকের নির্দেশে বেয়ারা ছুটে গিয়ে সেলাম জানাল মলি মেম-সাহেবকে।

শিফন লিপস্টিক রুজ পাউডার এনামেল-এর একটি জীবন্ত প্রদর্শনী হাই-হিল সু-তে খুট্‌ খুট্‌ আওয়াজ তুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মিহি সুরে বলল, আমায় ডেকেছ বাপি?

কথা বললেন মালিক, হ্যাঁ মা, আমরা তোমায় ডেকেছি। আমাদের কারখানার কর্মী মিঃ সেন একটা নতুন ধরনের মাইক তৈরি করেছেন। এতক্ষণ ধরে সেটার ডেমন্‌স্ট্রেশন আমরা দেখলাম। এইবার তোমার সুরেলা গলায় সেটাকে টেস্ট করে নিতে চাই, অবশ্য যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে।

মলি ছোট একটু 'স্রাগ' করে হেসে বলল, কী যে বলেন আপনি। আপত্তি কেন থাকবে?

তারপর মিঃ মজুমদারের দিকে চেয়ে বলল, আমি তাহলে গাইব বাপি ?

নিশ্চয় গাইবে। এঁরা সবাই যখন বলছেন—

লঘু ছন্দে মাইকের কাছে এগিয়ে গেল সে।

সমীর হাঁ করে তাকিয়ে ছিল মলির দিকে। ওর চাল-চলন, মৃদু সুরেলা বাকভঙ্গী, শিফন-এনামেল-রুজের সাজসজ্জা, দুধে-আলতায় মেশানো অপরূপ গাত্রবর্ণ—সব মিলিয়ে মলি যেন রূপকথার এক অপরূপা রাজকন্যা হয়ে সমীরের চোখের সামনে আবির্ভূত হয়েছে।

জীবন্ত মানুষ কি কখনও এমন পুতুলের মতন সাজানো-গোছানো হয় ?

তার চোখের সামনে চলছে ফিরছে এ কি কোন জীবন্ত মানুষ, না পরীর দেশের কোন পথহারা পরীকন্যা ?

সমীরের চমক ভাঙল মলির মিহি গলার আওয়াজে।

মিলি বলল, প্লিজ, মাইকটা যদি একটু অ্যাডজাস্ট করে দেন।

চমকে উঠল সমীর। বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, করে দিচ্ছি।

তাড়াতাড়ি একটু এগিয়ে যেয়ে মাইকের সামনে ঝুকে পড়ে যেমন সে যন্ত্রটাকে ঠিক করতে গেল অমনি অসর্কতাবশতঃ তার কপালটা আল্‌তো ভাবে মলির কপালের সঙ্গে ঠুকে গেল।

মাথায় বুঝি বজ্রাঘাত হল সমীরের।

সভয়ে এক পা পিছিয়ে যেয়ে কাঁপা গলায় সে বলে উঠল, দেখুন —মানে—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল মলি। কলস্বনা ঝরণার মত বলে উঠল, দ্যাট্‌স্ অল্ রাইট। আমি বুঝতে পেরেছি। কেমন হল তো ? নিন, মাইকটা এইবার ঠিক করে দিন। ওদিকে ওরা সব হাসছেন যে আমাদের দশা দেখে।

সেই দশা যে একদিন দশমহাবিদ্যার রূপ ধরে সমীরের স্বপ্নময়

জীবনকে ভেঙে চুড়ে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে সে সম্ভাবনার বীজ সেইদিনই অঙ্কুরিত হল মলির মনে। বুঝি বা সমীরের মনেও।

মলির গান এক সময় শেষ হল।

অভ্যাগতজনের আর একদফা হাততালি পড়ল।

খুশি মনে সবাই উঠে পড়লেন যার যার আসন থেকে। আপিস ঘরের প্রশস্ত বারান্দায় ছোট ছোট চায়ের টেবিল পাতা হয়েছিল। সেইখানে যেয়ে বসলেন সবাই।

মলির অনুরোধে সমীরও যেয়ে তাদের সঙ্গেই বসল একটা টেবিলে।

মলি বলল, আপনাকে তো আগে কখনও দেখি নি এখানে। আপনি বুঝি মেকানিক হিসেবে নতুন ঢুকেছেন?

সমীর বিব্রত কণ্ঠে বলতে যাচ্ছিল, আজ্ঞে না, মানে—আমি—

তাকে সে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন মিঃ মজুমদার, বললেন, আমাদের ফ্যাক্টরিতে ইনি নতুনই ঢুকেছেন। তবে এর সামনে এখন খুব ব্রাইট প্রস্‌পেক্‌ট রয়েছে। ভাল কথা মনে পড়ল, তোমরা বরং বসে একটু গল্প কর, আমি একবার সিনিয়র ডিরেক্টর মিঃ সান্যালের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।

সিনিয়র ডিরেক্টর মিঃ সান্যালকে তাঁর গাড়িতে তুলে দিয়ে হাসি মুখে ফিরে এলেন মিঃ মজুমদার।

বললেন, তোমার জন্যে সুখবর আছে সেন।

চমকে উঠে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তাকাল সমীর। তার মনে হল, একটু আগেই মিঃ মজুমদার তাকে 'মিঃ সেন' ও 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছিলেন। এরই মধ্যে আবার সে 'তুমি'র পর্যায়ে নেমে গেল কোন্ অপরাধে সেটা সে বুঝতে পারল না।

মিঃ মজুমদার বললেন, বস, বস। তোমাকে তুমি বলছি বলে রাগ করলে না তো ?

সমীর আমতা আমতা করে বলল, আজ্ঞে না, তাতে কি হয়েছে, আপনি আমাকে তুমি বলেই ডাকবেন।

দ্যাট্‌স্‌ লাইক এ গুড বয়। আমাকে তোমার একজন ওয়েল-উইশার বলেই জেন।

আজ্ঞে, এ আমার সৌভাগ্য।

মলি বলল, কিন্তু বাবা, সুখবরের কথা কি বলছিলে না তুমি ?

ও হ্যাঁ। দেখ সেন, সিনিয়র ডিরেকটার মিঃ সান্যাল তোমার ডেমনস্ট্রেশন দেখে খুব খুশি হয়েছেন। আমি একটু বলাতেই তিনি তোমাকে মেকানিজম ডিপার্টমেণ্টে প্রমোশন দিয়ে গেছেন। উইশ্‌ ইউ গুড্‌লাক।

সমীর দুই হাত এক করে বলল, আপনার অনুগ্রহেই এ সম্ভব হয়েছে।

ওঃ নো নো ইয়ংম্যান, ও সব অনুগ্রহ-ট্রহ কিছু নয়। আসল কথা হচ্ছে তোমার পার্সোন্যালিটি, তোমার অ্যাম্বিশান, তোমার অধ্যবসায়, তোমার ইনিশিয়েটিভ···

চা-সভা এক সময় ভেঙে গেল।

সমীরকে বার বার তাদের বাড়িতে যাবার অনুরোধ জানিয়ে মলি এক সময় গাড়িতে উঠে বসল।

ইঞ্জিনের হৃদপিণ্ড কাঁপিয়ে গাড়িও এক সময় স্টার্ট নিল। আসন্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে বিলীয়মান গাড়ির পিছনের লাল আলোটা একটি চলমান রক্তবিন্দুর মত সমীরের চোখের সামনে কাঁপতে লাগল।

সমীর একদৃষ্টিতে সেই দিকেই চেয়েছিল।

চমক ভাঙল তিমিরের ডাকে।

গম্ভীর গলায় তিমির বলল, ওরা চলে গেছে। এইবার বাসায় চল।

ওঃ, কে দাদা! জান, আমাকে ওরা মেকানিজম ডিপার্টমেণ্টে প্রমোশন দিয়ে গেলেন।

শুনেছি।

ছোট সাহেব মিঃ মজুমদার খুব ভাল লোক, না দাদা?

হ্যাঁ। তবে তার মেয়ে মিস্ মজুমদার আরও ভাল লোক, কি বল?

একটু মৃদু হেসেই কথা কয়টি বলল তিমির। কিন্তু তার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটা সমীরের কানকে এড়াতে পারল না! এতক্ষণে যেন সহসা সমগ্র পরিস্থিতিটা সম্পর্কে সে সচেতন হতে পারল। তার খেয়াল হল ডেমনস্ট্রেশন দেবার জন্যে সভাকক্ষে ঢুকবার সময় থেকে এই দীর্ঘ সময় তিমির তারই জন্য উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় বাইরে অপেক্ষা করে ছিল। আর মিস্ মলি ও মিঃ মজুমদারের আকস্মিক সাহচর্য ও সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে সে এতক্ষণ তিমিরের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। এমন কি সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে তার সাফল্যের সংবাদটা তাঁকে দেবার কথা পর্যন্ত সে ভুলে গিয়েছিল।

তিমিরের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে সে বলল, সত্যি দাদা, আমার ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে, তোমাকে এতক্ষণ বসিয়ে—

তাকে বাধা দিয়ে পূর্ববৎ শান্ত গলায়ই তিমির বলল, ও সব কথা থাক। এখন চল।

সমীরের দিকে আর দৃকপাতমাত্র না করে তিমির কারখানার গেটের দিকে পা চালিয়ে দিল।

তাঁর সেই দৃপ্ত গমন-ভঙ্গীর দিকে চেয়ে লজ্জায় অনুশোচনায় ও বেদনায় সমীর যেন একেবারে মাটিতে মিশে যেতে লাগল।

। দশ ॥

ট্রেন চলেছে।

কত মাঠ, কত নদী, কত পথ, কত শহর-গ্রাম পেরিয়ে ট্রেন চলেছে।

সেই ট্রেনে চেপে অশ্রু চলেছে কলকাতায়।

সমীর চিঠি লিখেছে :

চিঠি পেয়েই তুমি কলকাতা চলে এস দিদি। উপরে ঠিকানা দিলাম। তাছাড়া তুমি কবে পৌঁছিবে জানাও। আমি নিজে স্টেশনে হাজির থাকব।

তুমি হয় তো খুব অবাক হয়ে গিয়েছ। ভাবছ, তোমার ভাইটি কি হঠাৎ পাগল হয়ে গেল নাকি?

কি জান, তোমার ভগবান এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছে। চাকরিতে আমার পদোন্নতি হয়েছে। মজুর থেকে মেকানিক। মাইনেও বেশ কিছুটা বেড়েছে। ভরসা করছি, আরও বাড়বে।

ছোট একটি বাসা নিয়েছি। খাস কলকাতায় নয়। তবে কলকাতার কাছেই। আশা করছি, তোমার খুব ভাল লাগবে। দুখানা ঘর। সামনে টানা বারান্দা। তার নিচেই বাড়ির একেবারে সামনেই কি আছে জান? একটা করবা ফুলের গাছ। এলেই দেখতে পাবে, হলদে ফুলে গাছটা একেবারে ভরে আছে।...

করবী ফুল। হলদে ফুল।

চকিতেই আর একটি হলুদ করবী ফুলের গাছ অশ্রুর স্মৃতির পটে ভেসে উঠল। একটা মিষ্টি হাসি খেলে গেল তার সারা মুখে।

পরমুহূর্তেই যেন বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে থম্ থম্ করে উঠল তার মন।

অশ্রুর মনে পড়ল, এ-চিঠিতে সমীর কোথাও তার দাদার কথা কিছুই লেখে নি। প্রথম প্রথম সমীরের প্রতিটি চিঠি তার দাদার কথায় ভরা থাকত। ইদানীং যেন তার চিঠিতে সে উচ্ছ্বাসে ভাঁটা পড়েছে। তবু সব চিঠিতেই তার উল্লেখ থাকত। শুধু এই চিঠিটাই ব্যতিক্রম। তিমিরের তিলমাত্র উল্লেখ নেই এ-চিঠিতে।

এর কারণ কি?

চিঠি পাবার পর থেকে অশ্রু অনেক ভেবেছে। কিন্তু কোন কূল-কিনারা করতে পারে নি।

তবে কি সমীর আর তিমিরের মধ্যে ইদানীং কোন মনোমালিন্য ঘটেছে?

কি নিয়ে ঘটতে পারে মানোমালিন্য?

তবে কি—তবে কি অশ্রুর কলকাতা যাওয়ায় আপত্তি করেছে তিমির? সে কি আশংকা করেছে যে অশ্রু কলকাতায় গেলে তার সামনে সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না?

হারিয়ে-যাওয়া অতীতের একটি বিষণ্ন স্মৃতির কাঁটা তার বুকের মধ্যে অবিরাম খচ্ খচ্ করে বিঁধবে?

না পারবে সে অশ্রুকে কাছে টেনে নিতে, আর না পারবে প্রাণ ধরে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে। এই টানা-পড়েনের দোটানায় পড়ে প্রাণ তার হাবু-ডুবু খাবে।

তাই কি তিমির চেয়েছে যে অশ্রু যেন কলকাতায় না যায়। আর তাই নিয়েই কি সংঘাত বেঁধেছে দাদা আর ভাইতে?

তাই কি সমীর চিঠিতে তার উল্লেখমাত্র করে নি?

সম্ভাবনাটা মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠতেই এতদিন পরেও অশ্রুর বুকের ভিতরটা যেন নতুন করে বেদনায় টন্‌টন্ করে উঠল!

ট্রেনের খোলা জানালা পথে হু-হু হাওয়া এসে তার তৈলহীন রুক্ষ চুলগুলোকে এলোমেলো উড়িয়ে দিচ্ছিল। তবু তার কপালের দুপাশের দুটো শিরা যেন যন্ত্রণায় দপ দপ করতে লাগল।

ডান হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা দিয়ে দুটো শিরাকে চেপে ধরে নিজের মনেই অশ্রু বলে উঠল, ওগো না না, সে আশংকা তুমি করো না। সেদিনের সে স্মৃতির কাঁটায় আমার অন্তর যতই ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হোক, সে কাঁটা তোমার পায়ে আমি এতটুকুও বিঁধতে দেব না। চোখের জলকে নিঃশেষে মুছে ফেলে তোমার সামনে যেয়ে দাঁড়াবে এক নতুন অশ্রু। তাকে তুমি চিনেও চিনতে পারবে না। বুঝেও বুঝতে পারবে না। যে অসহায় কিশোরী একদিন একান্ত আগ্রহে শুধু তোমারই মুখের দিকে চেয়ে ছিল প্রহরের পর প্রহর, আর তার পরে এক সময় তার ছোট মনের সব আশা সব স্বপ্নের জ্বলন্ত চিন্তা বুকে নিয়ে বাণবিদ্ধ হরিণীর মত সাশ্রুনেত্রে কাঁপতে কাঁপতে বিদায় নিয়েছিল তোমার কাছ থেকে,—তুমি বিশ্বাস কর, তুমি ভরসা রাখ, সে আর কোনদিন তোমার কাছে ফিরে আসবে না।

অশ্রুর চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে জলের ফোঁটা পড়তে লাগল জানালার ষ্টিলের ফ্রেমে।

বাঁ হাত দিয়ে চোখ মুছে আবার চোখ বুজল অশ্রু।

তার মনের পর্দার উপরে স্মৃতির ছায়াছবি ঝিলমিল করে উঠল।

সে দিন বিকেল বেলা ভিতরের দাওয়ায় বসে কী যেন কাজ করছিলেন মা।

অশ্রুদের পড়বার ঘরে ছিল অশ্রু আর তিমির। কলকাতা থেকে আনা একখানা সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস থেকে পড়ে শোনাচ্ছিল তিমির। একাগ্র মনে শুনছিল অশ্রু।

খিড়কির দরজা ঠেলে উঠোনে পা দিলেন পাশের বাড়ির ডেপুটি-গিন্নি সারদাময়ী।

অশ্রুর মা হেমাঙ্গিনী হেসে অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন দিদি, আসুন। কী সৌভাগ্য আমার, গরীবের ঘরে যে হাতির পাড়া।

দাওয়ার উপরে ফুল-তোলা একখানা আসন পেতে দিলেন হেমাঙ্গিনী।

ভারী শরীরটা নিয়ে তার উপর বসতে বসতে সারদাময়ী জবাব দিলেন, তা যা বলেছেন! হাতির পাড়াই বটে। দেহটার যে কী হয়েছে দিদি, কিছুতেই কমাতে পারছি না।

হেসে উঠলেন হেমাঙ্গিনী, ও মা! তাই বুঝি বলেছি আমি। কথায় দেখছি আপনি ডেপুটিবাবুকেও হার মানালেন।

পাশের ঘর থেকে তিমির আর অশ্রুর একটা মিলিত হাসির শব্দ ভেসে এল। বোধ হয় উপন্যাসের কোন রঙ্গভরা অধ্যায় পড়া হচ্ছিল তখন।

সে দিকে কান পেতে সারদাময়ী বললেন, আমার গুণধরটি বুঝি এসে হাজির হয়েছে?

মিস্টি হেসে হেমাঙ্গিনী বললেন, সে কি আর বলতে। দুজন তো অষ্টপহরই এক সঙ্গে। তা দিদি, ছেলে আপনার সত্যি গুণধর। সোনার টুকরো ছেলে। যেমন আচার-আচরণে তেমনি লেখাপড়ায়।

তা মেয়েটিও আপনার কম লক্ষ্মী নাকি? যেমন চেহারায় তেমনি চরিত্রে। আমাকে মাসিমা বলতে তো একেবারে অজ্ঞান। যখনই আমাদের বাড়ি যাবে যে কোন ছলছুতোয় একটা না একটা কাজ করে আমাকে সাহায্য করবেই। আহা! আমার তিমিরের জন্যে এমন একটি বৌ পাই তো আমার সাধ মেটে।

দুই বিস্ফারিত চোখ মেলে হেমাঙ্গিনী বললেন, আপনি সত্যি বলছেন দিদি?

সত্যি বলছি দিদি। আমার বড় সাধ। দুটিতে মিশেছেও বড় ভাল। শুভদিন যেদিন আসবে আপনার কোন অমত হবে না তো?

অমত? আপনি কি বলছেন? এতো অশ্রুর সাত জন্মের ভাগ্য। কিন্তু দিদি আমরা যে বড় গরীব। আমাদের ঘরে আত্মীয়তা করতে—

বাধা দিলেন সারদাময়ী, গরীব-বড়লোক শুধু টাকায় হয় না দিদি। আমাদের উনি তো বলেন—

আনন্দের আতিশয্যে মাঝপথেই তার কথায় বাধা দিয়ে হেমাঙ্গিনী বলে উঠলেন, ডেপুটিবাবুরও কি তাহলে মত আছে এতে ?

ওরে বাপরে ! বিয়ের কথা এখুনি তার কাছে কে তুলতে যাবে ! ছেলে এম, এ, পাশ করে ম্যাজিস্ট্রেট হবে, তবে তো বিয়ে।

হেমাঙ্গিনীর আশার বেলুন যেন সহসা চুপসে গেল। ম্লান গলায় তিনি বললেন, তাই বুঝি।

তারপর দুজনেই চুপচাপ।

নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল আরও দুটি কণ্ঠ। পাশের ঘর থেকে অধীর আগ্রহে দুই মায়ের আলোচনা শুনছিল আরও দুই জোড়া ব্যগ্র কর্ণ। শুনছিল আর হাসছিল নীরবে। দুই চোখে চোখে চলছিল কত না-বলা ভাষার আলাপচারি।

ক্রমে মুখর হল দুটি কণ্ঠ।

এই শুনলে ?

তুমি শুনে রাখ মন দিয়ে। যা ডেপুটি বাপ্ তোমার। এক কলমের খোঁচায় কবে কী রায় দিয়ে বসবেন কে জানে।

কণ্ঠস্বরে কেমন একটা বেপরোয়া দুঃসাহসের আমেজ এনে তিমির বলল, ইস্, রায় অমনি যা তা দিলেই হল। আমি কি ফাঁসির আসামী নাকি ?

আচ্ছা, সত্যি যদি তোমার বাবা অমত করে বসেন ?

আমার অমত হবে না।

সত্যি বলছ ?

সত্যি।

তিন সত্যি ?

তিন সত্যি।

হায় তারুণ্য ! হায়রে তার অনভিজ্ঞ দুঃসাহস।

বাস্তবের এক দমকা হাওয়ায় সেদিনের সব স্বপ্ন সকল উৎসাহের দীপ একদিন নিভে যায়। পড়ে থাকে শুধু বিষন্ন স্মৃতির ধূমাঙ্কিত কালি!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল অশ্রু।

কাছে ও দূরের নীল বনরেখা চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে সরে সরে যাচ্ছে।

ঠিক অমনি করেই তার চোখের সামনে থেকেও একদিন সরে গিয়েছিল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল মনের সব স্বপ্নের নীল বনরেখা।

আদিগন্ত বিসর্পিত হয়ে পড়েছিল তৃষাদীর্ণ মরুভূমির দগ্ধ হাহাকার।

সবই মনে পড়ছে অশ্রুর।

বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে বাসায় ফিরল তিমির। সম্মুখে অখণ্ড অবসর।

অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে ছিল অশ্রু। দেখতে আরও অনেক সুন্দর হয়েছে তিমির। তরুণ গোঁফের কৃষ্ণাভ রেখায় সারা মুখখানাকে ঘিরে রয়েছে এক নতুন বীর্যবত্তার স্বাক্ষর। দুটি চোখে যেন স্বপ্নের অঞ্জন মাখানো। দুটি চোয়ালের পরিস্ফুট কাঠিন্যে শক্তিমত্তার আভাষ।

হেসে তিমির বলল, কি দেখছ ওমন করে?

এবার তুমি অনেক সুন্দর হয়েছ দেখতে।

পুরুষ মানুষ হলেও কথা কয়টি শুনে তিমিরের গোলাপী গাল দুটো বুঝি রক্তিম হয়ে উঠল।

পরমুহূর্তেই সে হেসে বলল, তোমাদের বাড়ি বুঝি আয়না নেই?

আয়না? কেন বল তো?

নিজের চেহারাটা তাহলে দেখতে পেতে। বুঝতে পারতে যে পুষ্পধণ্বার তূণ উজাড় করে সব কয়টি তীর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ওই একখানা মুখেই। মরি মরি মরি!

বলতে বলতেই মৃদুকণ্ঠে তিমির বৈষ্ণব কবিতার দুটি লাইন আবৃত্তি করে ফেলল, জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।

অলক্ষ্যে থেকে ভাগ্য-দেবতা সেদিন বুঝি হাসল।

কয়েকদিন পরেই ডেপুটি শ্রীঅধীর প্রসন্ন রায়ের বদলির অর্ডার এল উপর থেকে।

বাড়িতে সাজ সাজ রবে পড়ে গেল।

কিন্তু আকাশ ভেঙে পড়ল অশ্রু-তিমিরের মাথায়।

কি হবে তাহলে ?

কি আবার হবে ? যা হবার কথা আছে তাই হবে।

কিন্তু তোমরা যে চলে যাচ্ছ ?

বাংলা দেশের একটা জেলা থেকে আর একটা জেলা দুরধিগম্য নয়।

তা নয় জানি, তবু আমার কেমন ভয় করছে।

তার মানে আমার উপর তুমি ভরসা করতে পারছ না ?

ঠিক তা নয়। তবু—আচ্ছা তুমি এক কাজ কর না।

কি ?

তোমার বাবাকে সব কথা খুলে বল না।

পাগল! এখন বাবাকে ও সব বলতে গেলে যে মূর্তি তিনি ধারণ করবেন তার সামনে আমি দাঁড়াতে পারব না।

কেন পারবে না ?

বাপরে! মদনভস্মের ভয় নেই বুঝি ?

তবু মদন ভস্মই হল।

ডেপুটি-পিতার কাছে প্রস্তাবটা পেশ করবার সাহস অবশ্য তিমিরের হয় নি। প্রস্তাব পেশ করলেন অমিয়বাবু। ডেপুটিবাবুর ড্রয়িংরূমে বসেই কথা হয়েছিল।

একটু ইতস্তত করেই কথাটা তুললেন অমিয়বাবু। বললেন, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল মিঃ রায়।

বলুন।

আপনি তো চলে যাচ্ছেন শীগগিরই—

কি আর করি বলুন? সরকারী চাকরি, যাও বললে তো না বলা চলবে না।

আজ্ঞে, তা তো বটেই। কি জানেন, আপনার মুখের দিকে চেয়েই তো আছি এতদিন। তাই যাবার আগে যদি একটু ভরসা দিয়ে যান—

ভরসা! ভ্রূ কুঁচকে চোখ তুলে তাকালেন অধীর প্রসন্ন। পুরু লেন্সে আলো পড়ে ঝকঝক করে উঠল। বললেন, আপনার কথা তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মাস্টারমশায়।

আজ্ঞে, আপনার স্ত্রীর কাছে কি আপনি কিছুই শোনেন নি তাহলে?

আমার স্ত্রীর কাছে? অধীর প্রসন্নর বিস্ময় যেন এবার বিরক্তির ধার ছুঁয়ে গেল।

সেটা অনুভব করেও অমিয়বাবু সাধারণ ভাবেই বললেন, মানে আপনার স্ত্রী আর আমার স্ত্রীর মধ্যেই কথাটা হয়েছে কিনা তাই।

হেয়ালি রেখে কথাটা একটু স্পষ্ট করে বলুন তো মাস্টারমশায়। কি ব্যাপার?

আজ্ঞে, আমার মেয়ের বিয়ের কথাটাই আমি বলতে এসেছি।

বিয়ে? আপনার মেয়ে অশ্রুর? তাতে আমাকে কি করতে হবে? কোথায় বিয়ে দিচ্ছেন?

আজ্ঞে, সেই কথাই তো আপনাকে বলতে চাই। আমি ভেবেছিলাম, সবই আপনি শুনেছেন আপনার স্ত্রীর কাছে—

ব্যাপারটা যেন এতক্ষণে আঁচ করতে পারলেন অধীর প্রসন্ন। অপ্রসন্নতায় হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল তার মুখমণ্ডল। একটু রুষ্ট

গলায়ই বললেন, আমার হাতে এখন অনেক কাজ মাস্টারমশায়। আপনার বক্তব্যটা একটু সংক্ষেপে শেষ করলে ভাল হয়।

আজ্ঞে কথা তো শেষ হয়েই গেছে। এখন আপনি শুধু একটু ভরসা দিলেই হয়।

বিয়ে দেবেন আপনার মেয়ের। তার মধ্যে আমি ভরসা দেবার কে?

জবাব দিলেন অমিয়বাবু, আজ্ঞে, আপনি তো ছেলের বাবা।

মানে! ছিন্নগুণ ধনুকের মত হঠাৎ একেবারে সোজা হয়ে বসলেন অধীর প্রসন্ন। কড়া গলায় বললেন, এ উদ্ভট কল্পনা আপনার মাথায় এল কি করে আমি শুধু তাই ভাবছি।

উদ্ভট কল্পনা! আপনি কি বলছেন মিঃ রায়?

যা সত্যি তাই বলছি। শুনুন, আমার ছেলে দুদিন বাদে বিলেত যাবে, আই, সি, এস হয়ে ফিরবে। তার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ের কথা আপনি ভাবলেন কি করে?

কিন্তু আপনার স্ত্রী যে কথা দিয়েছেন। সেই কথার উপর ভরসা করেই আমবা ওদের দুজনকে খোলাখুলি ভাবে মিশতে দিয়েছি, পরস্পরকে ওরা ভালবাসে—

গর্জে উঠলেন অধীরপ্রসন্ন, আপনি থামুন। মেয়েলি গল্পচ্ছলে কে একদিন কি বলেছে তাকেই 'ব্যাঙ্ক' করে আপনি যদি আকাশ-কুসুম রচনা করে থাকেন সে অপরাধ আমার নয়: আর ভালবাসার কথা বলছেন? প্রথম যৌবনে একত্রে মেলামেশা করলে ছেলেমেয়েদের মনে ও রকম একটু-আধটু রঙ লাগে। দুদিন বিলেতের হাওয়া লাগলেই ও রঙ ধুয়ে মুছে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

অপমানে ক্ষোভে বেদনায় অমিয়বাবু যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেলেন। তবু ধরা গলায় বললেন, এই কি তাহলে আপনার শেষ কথা মিঃ রায়?

বাঁকা হাসি হেসে অধীর প্রসন্ন বললেন, যে কথা শুরুই হয়নি

তার আবার শেষ কি? তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক যে তিমিরকে জামাই করবার দুরাশা আপনার মত বিচক্ষণ ব্যক্তির না করাই উচিত ছিল।

এ কথার পর আর একটি কথাও বলেন নি অমিয়বাবু। বলতে পারেন নি। ইচ্ছাও হয় নি। মাথা নিচু করে ডেপুটিবাবুর ড্রয়িং রুম থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

অন্যমনস্ক ভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, বাড়ির সামনের ছোট মাঠটার এক কোণে করবী গাছের ও-ধারে পাশাপাশি বসে আছে তিমির আর অশ্রু।

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলেছে। তবু শুক্লপক্ষের চাঁদ-জাগা আকাশের নিচে খোলা মাঠটা তখনও একেবারে অন্ধকার হয়নি। এ রকম সময়ে ঘরের সিঁড়িতে বা বারান্দায় বসে অনেক সময়ই ওরা দুজনে গল্প-গুজব করে।

কিন্তু সেদিন ওদের দুজনকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে অমিয় বাবুর বুকের ভিতরটা যেন রি-রি করে উঠল।

সিঁড়িতে একটা পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। মুহূর্তমাত্র কী যেন ভাবলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, অশ্রু!

কী যেন মেশানো ছিল সে ডাকে, শুনেই চমকে উঠল অশ্রু। একবার তাকাল তিমিরের দিকে। তারপর উঠে বাবার সামনে এসে দাঁড়াল।

গম্ভীর গলায় অমিয়বাবু বললেন, তুমি ভিতরে যাও অশ্রু।

মুখ তুলে তাকাল অশ্রু। সন্ধ্যার আবছায়া আলোতেও সে স্পষ্ট দেখতে পেল তার বাবার সমস্ত মুখখানা ঝড়ের আকাশের মত থম্ থম্ করছে।

কোন কথা না বলে মুখ নিচু করে সে ভিতরে চলে গেল।

কথা বলল তিমির, কি হয়েছে কাকাবাবু?

বুকের ভিতরটা হঠাৎ মুচড়ে উঠল অমিয়বাবুর। একটা কড়া

জবাব দেবার জন্য মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই স্বভাবসিদ্ধ সংযমের সঙ্গে ক্রোধ দমন করলেন তিনি। গম্ভীর নিরুত্তাপ গলায় বললেন, দেখ তিমির, বড় লোকের ছেলে হলেও তুমি আমার স্নেহভাজন। তাই বলছি, আর কোনদিন তুমি এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়িও না।

কথা শেষ করেই তিনি ভিতরে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

বাধা দিল তিমির। বলল, কিন্তু, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না কাকাবাবু ?

কোন কথাই এখন আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। আর তার কোন দরকারও নেই। বাড়ি ফিরে গেলেই সব বুঝতে পারবে। এখন যাও।

দ্রুত পায়ে ভিতরে চলে গেলেন অমিয়বাবু।

ভূতে-পাওয়া মানুষের মত তাঁর গমন-পথের দিকে খানিক হাঁ করে চেয়ে থেকে পায়ে পায়ে বাড়ি ফিরে গেল তিমির।

সবই জানল। আগুন জ্বলে উঠল মাথার মধ্যে। সমস্ত মন হাহাকার করে উঠল। না না, এ কিছুতেই হতে পারে না। অশ্রুকে সে কথা দিয়েছে। তাকে সে ভালবাসে।

কিন্তু উপায় কি ?

বাবাকে সে চেনে। ভাল করেই চেনে। একবার যে কথা তিনি না করেছেন কিছুতেই তাকে আর হ্যাঁ করানো যাবে না।

তবু মরিয়া হয়ে বাবার কাছে যেয়ে দাঁড়াল তিমির। মনের সমস্ত শক্তি এক করে বলল, কিন্তু বাবা, অশ্রুকে আমি কথা দিয়েছি।

গম্ভীর গলায় অধীর প্রসন্ন বললেন, চুপ করো। আমার এখন অনেক কাজ। বাজে বিরক্ত করো না।

মাও ওঁদের কথা দিয়েছেন।

সে নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার মার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয় আমি করব। তুমি এখন যাও।

তিমির তবু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই রইল। তার দুটি পা বুঝি পাষাণ হয়ে গেছে।

আপন মনে কাজ করতে করতে এক সময় চোখ তুলে তাকালেন অধীর প্রসন্ন। ধীরে ধীরে বললেন, তিমির, তুমি এখনও ছেলেমানুষ, তাই বুঝতে পারছ না যে সাময়িক একটা ভাবাবেগের চেয়ে জীবনটা অনেক বড়। তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে না। অন্তত আমি তা খেলতে দেব না তোমাকে। তুমি আমার সন্তান।

অধীর প্রসন্নর স্নেহসিক্ত নরম কথাগুলো শুনে কেমন যেন সাহস বেড়ে গেল তিমিরের। টেনে টেনে ভয়ে ভয়ে সে বলল, কিন্তু বাবা, আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে এ বিয়ের সঙ্গে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সম্পর্ক কি?

এ সমস্যা নিয়ে ছেলের সঙ্গে তর্ক করবার মত মানসিক গঠন অধীর প্রসন্নর নয়। মুহূর্তে পুনরায় আত্মস্থ হলেন তিনি। তাঁর বুকের ভিতর থেকে মাথা চাড়া দিল ডেপুটি মিঃ রায়। কড়া গলায় ধমকের স্বরে তিনি বললেন, এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কোন তর্ক করবার সময় আমার নেই। প্রয়োজনও নেই। শুধু জেনে রাখ, আমার আশ্রয় ও অন্নের যদি তোমার কণামাত্রও প্রয়োজন থাকে তাহলে এ শহর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার সব কিছু তোমাকে 'ক্লীন' ভুলে যেতে হবে।

কিন্তু ভুলে যেতে বললেই কি ভুলে যাওয়া যায়?

বুকের রক্তে যার ছবি আঁকা, আদেশ করলেই কি মন থেকে তার স্মৃতিকে মুছে ফেলা যায়?

তবু অশ্রুকে বুঝি ভুলেই গেল তিমির। অন্ন ও আশ্রয়ের আশ্বাসই বুঝি হৃদয়াবেগের চেয়েও বড় হল তার কাছে।

বাবার সামনে আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এক সময়ে ঘাড়

নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তিমির।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, মনের মধ্যে প্রতিবাদের একটা নিষ্ফল ঝড়ও হয় তো গর্জাতে লাগল, কিন্তু ডেপুটি মিঃ অধীর প্রসন্ন রায়ের বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে স্বল্পবাক্ শিক্ষক অমিয় কান্তি সেনের বাড়ির চৌকাঠ অতিক্রম করবার সাহস আর হল না তিমিরের। বাড়ির পিছন দিককার নিজের নির্জন ঘরে বিছানায় উপুর হয়ে পড়ে দুঃসহ অন্তর্দাহে শুধু জ্বলতে লাগল।

কিন্তু ডেপুটিবাড়ির চৌকাঠ অতিক্রম করেছিল সেদিন দুঃসাহসী অশ্রু।

তখন অনেক রাত। ঘরে ঘরে সবাই ঘুমে অচেতন। নির্জন নিস্তব্ধ পথঘাট। শুধু দুই বাড়ির মাঝখানের মস্তবড় ঝাকরা বট-গাছটার ডালে ডালে কিছু কিছু পাখা-ঝটপটানির শব্দ। কখনও মৃদু বাতাসে একটা অস্পষ্ট রহস্যময় আওয়াজ।

দুরু দুরু কাঁপা বুকে সেই ভুতুড়ে বটগাছটার নিচ দিয়ে সেদিন এক দুঃসাহসিক অভিসারে বের হয়েছিল অশ্রু।

মৃদু হাতে আঘাত করেছিল তিমিরের রুদ্ধ দরজায়।

ঠুক ঠুক ঠুক।

চমকে উঠেছিল তিমির। কান পেতেছিল অধীর আগ্রহে। দরজায় আঘাত করবার এই বিশেষ ভঙ্গীটি যে তার বড় পরিচিত।

তারপর ?

নিজেকে নিঃশেষে তিমিরের কাছে সঁপে দিয়ে অশ্রু বলেছিল, তুমি আমাকে গ্রহণ কর তিমিরদা। আমার যে আর কোন উপায় নেই।

তিমির দুই বাহু ধরে সাদরে তাকে তুলে ধরেছিল। বাষ্পসিক্ত অপলক চোখে নীরবে চেয়ে ছিল তার মুখের দিকে।

অনেক—অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে ছিল।

তবু অশ্রুকে সেদিন কাছে টেনে নিতে পারেনি। সে সাহস তার ছিল না।

অভাব কি ছিল হৃদয়ের গভীর ভালবাসারও ?

দীর্ণ অন্তরের এই আকুল প্রশ্নের জবাব সেদিনও অশ্রু পায় নি। আজও এত দীর্ঘ কাল পরেও সে প্রশ্নের জবাব সে পায় নি।

শুধু মনে পড়ে মুহূর্তের পর মুহূর্ত নিঃশব্দে ঝড়ে গিয়েছিল মহাকালের মরু-সৈকতে। দুটি কাতর চোখ তুলে অশ্রু বৃথাই তাকিয়ে ছিল তিমিরের দুটি ভাষাহীন চোখের দিকে। তারপর একসময় বাণবিদ্ধ হরিণীর মত তীব্র বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল তিমিরের ঘর থেকে।

শুধু মনে পড়ে, সেই বেদনাবিক্ষুব্ধ বিদায়ের মুহূর্তেও একটি কথাও আর বলে নি তিমির। একটি বারও গভীর আবেগে তাকে ডাকে নি—ফের অশ্রু—ফের।

আজও ডাকে নি তিমির। মুখ ফুটে আজও বলে নি—ফিরে এস অশ্রু—ফিরে এস।

তবু চলেছে অশ্রু।

কলকাতা চলেছে।

হয় তো তিমিরের কাছেই ফিরে চলেছে।

কিন্তু তিমির ?

সেও কি ফিরে আসবে ?

একটা ঝম্-ঝম্ শব্দে চমক ভাঙল অশ্রুর। বিরাট ঢাকা প্ল্যাট-ফর্মের ভিতরে ট্রেনটা ঢুকছে।

মাথাটা নাড়া দিয়ে একটু আত্মস্থ হয়ে ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল অশ্রু।

ট্রেন দাঁড়াল।

একটু পরেই সমীর এসে দাঁড়াল তার জানালার সামনে। তার চোখ মুখ খুশিতে নাচছে।

ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে দুজন রওনা হল।

নানা কথার পর সমীর বলল, বাসা যা পেয়েছি না দিদি, দেখলেই তোমার পছন্দ হয়ে যাবে। অবশ্য ছোট বাসা, কিন্তু বেশ ভাল। সামনে ছোট একটু বাগান। একটা করবী ফুলের গাছ—

অশ্রু বলল, হ্যাঁরে সমীর, তোর তিমিরদা এল না স্টেশনে?

তিমিরদা? সমীর একটু বিস্মিত হল।

হ্যাঁরে। সেই—তোর যে দাদার কথা চিঠিতে এত করে লিখতি?

ওঃ দাদা! কিন্তু তার নাম যে তিমির তা তুমি জানলে কেমন করে?

বাঃ! তুই-ই তো লিখেছিলি চিঠিতে।

তাই বুঝি?

চোখ তুলে তাকিয়ে একটু হাসল সমীর।

জানালা দিয়ে বাইরের জনাকীর্ণ রাজপথের দিকে তাকিয়ে ছিল অশ্রু। তেমনি ভাবেই বলল, আমি আজ আসব সে কথা বলেছিলি তোর দাদাকে?

হুঁ।

তবু সে এল না? প্রশ্নটা করেই কেমন যেন লজ্জিত বোধ করল অশ্রু। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল সমীরের দিকে।

সমীর একটু গম্ভীর গলায় বলল, দাদা আজকাল কেমন যেন বদলে গেছে দিদি।

বদলে গেছে!

তা নয় তো কি? আগে আমার সঙ্গে কেমন খোলাখুলি সব কথা হত। কিন্তু ইদানীং সে যেন বড় বেশী গম্ভীর হয়ে গেছে। তাছাড়া, এই বাসা করার ব্যাপারটাই ধর না। কত করে বললাম, দাদা, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। তা সে কিছুতেই রাজী হল না।

কি বলে?

বলে না কিছুই। পীড়াপীড়ি করলে গম্ভীর হয়ে বলে দেয়, তার পক্ষে এ সম্ভব নয়।

অশ্রুর মাথার মধ্যে অনেক প্রশ্নের কাঁটা যেন খচ খচ করে বিঁধতে লাগল—কেন সম্ভব নয় ? কিসের বাধা ? অশ্রু কি ?

জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল অশ্রু ।

রৌদ্রোজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে আকাশ যেন মরীচিকার মত ঝিলমিল করছে ।

বড় বেশী শানিত তার দীপ্তি । চোখ যেন জ্বালা করে ।

॥ এগারো ॥

ভাই-বোনের ছোট সংসার সুখের হাওয়ায় পাল তুলেই চলতে লাগল।

তবু একটা ব্যথার কাঁটা অশ্রুর মনকে অবিরাম বিঁধতে লাগল। কলকাতা আসা অবধি তিমির একটিবারও এ-বাসায় আসে নি।

অশ্রু বলে, কইরে, তোর দাদাকে তো একদিনও নিয়ে এলি না বাসায় ?

সমীর বলে, আমি বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি দিদি, দাদা কিছুতেই আসছে না।

কি বলে ?

বলে না তেমন কিছুই। শুধু একই ওজুহাত, সময় পাচ্ছি না। তোমরা একটু গুছিয়ে নাও, সময় পেলেই আমি যাব।

অশ্রু ভাবে : হায়রে, কবে সে সময় হবে! জেগে জেগে যে ঘুমোয়, তার ঘুম ভাঙাবে কে!

তবু শেষ পর্যন্ত একদিন তিমির এল। সমীরই ধরে নিয়ে এল।

কতকাল পরে আবার দুজন মুখোমুখি দাঁড়াল।

তিমির আর অশ্রু।

চোখের জল আর রাতের আঁধার।

দুটি বুকের তলে এ কিসের কলরোল ? আনন্দের, না বেদনার ?

বিস্মিত বিষন্ন দৃষ্টি মেলে তিমির চেয়ে ছিল অশ্রুর দিকে।

অশ্রু এক সময় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, বস, তিমিরদা।

তিমিরদা! তিমির নয়! যেন কত দূর থেকে ভেসে এল অশ্রুর কণ্ঠস্বর। মাঝখানে যেন যোজন পথের ব্যবধান!

কোন কথা বলতে পারল না তিমির। নিঃশব্দেই একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অশ্রু বলল, তুমি বস, আমি এখুনি আসছি।

চা-পর্ব শেষ হবার পর, পাটভাঙা একখানা থান পরে আবার যখন ঘরে ঢুকল অশ্রু, তিমির আর সমীর তখন কি একটা আলোচনায় মত্ত ছিল। অশ্রুকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলল, এই যে দিদি, তুমি দাদার কাছে বসো। আমাকে এখুনি একবার ছোট সাহেবের বাড়ি যেতে হবে। আমার মোটে সময় নেই। আচ্ছা, আমি তাহলে উঠি দাদা।

তিমির হেসে বলল, হ্যাঁ, তুমি কাজের মানুষ, তোমাকে আটকে রাখবে কে?

সমীর হাসতে হাসতে চলে গেল। ওরা দুজনে চুপচাপ বসে রইল মুখোমুখি।

এক সময় অশ্রু বলল, এতদিন আস নি কেন?

তিমির আমতা-আমতা করে বলল, আসি নি—মানে—এমনি—

না, এমনি নয়।

অশ্রুর গলায় এমন একটা কাঠিন্য ছিল যাতে তিমির চমকে উঠল। বলল, তার মানে?

মানে—এমনি নয়। ছিঃ ছিঃ তিমিরদা, তুমি আমাকে এতখানি ছোট ভাবলে কেমন করে?

তুমি কি বলছ?

ঠিকই বলছি। একথা তুমি কেমন করে ভাবলে যে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেই পুরনো দিনের ছুতো ধরে তোমার পায়ের উপর আমি উপুড় হয়ে পড়ব? আমি কি এত ছোট? আমার কি এতটুকু মর্যাদা বোধ নেই?

এ তুমি কি বলছ? তোমার সম্বন্ধে এমন কথা আমি ভাবতে পারি এ কি তুমি সত্যি বিশ্বাস কর?

আমি সব বিশ্বাস করি। কোন কিছুতেই আজ আর আমার অবিশ্বাস নেই। নইলে এতদিন আমি এখানে আছি, কেন তুমি একটি দিনের জন্যেও আমাকে দেখা দিলে না? কেন আমাকে এমন নিষ্ঠুরের মত এড়িয়ে চলেছ? তুমি কি একথা একবারও ভেবেছ যে তোমাকে শুধু চোখের দেখা দেখবার আশাতেই কত ব্যাকুল হয়ে আমি কলকাতা ছুটে এসেছি?

অস্পষ্ট চাপা গলায় কথাগুলো বলতে বলতে অশ্রুর দুই চোখের কোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তিমির ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, তোমাকে দেখবার আকুলতা আমারও কম নয়। কিন্তু কি করব, তুমি তো জান তোমার সামনে এসে দাঁড়াবার আমার মুখ নেই। আমি যে নিতান্ত কাপুরুষের মত সেদিন তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম—

বাধা দিল অশ্রু, সেদিনের কথা থাক তিমিরদা। সেদিনের কথা ভুলে যাও। মনে কর আমরা আর এক মানুষ, আর এক জগতে আমাদের দেখা হয়েছে।

কিন্তু ভুলে যেতে যে আমি পারি না—কিছুতেই পারি না। কেবলই মনে হয় একজনের জীবনের এই দুর্দশার জন্য আমিই তো দায়ী, আমারই দুর্বলতার ফল যে সে ভোগ করছে সারাটা জীবন—

ও কথা থাক তিমিরদা, একথা ভেবে বৃথাই তুমি মন খারাপ করছ। আসলে এ পৃথিবীতে কেউ কারও জন্য দায়ী নয়, সবই যার যার অদৃষ্ট। তাই যদি না হবে, তাহলে তোমারই বা আজ এ দশা হবে কেন?

তিমির সবিস্ময়ে বলল, আমার দশা? কি বলছ তুমি?

হ্যাঁ, বলতে আমার একটু ভুল হয়ে গেছে। দশা নয় দুর্দশা।

দুর্দশা?

নয়? তোমার তো বিলেত ফেরৎ আই, সি, এস, হবার কথা। তুমি কারখানায় মজুরি করছ কার দোষে? কপালের নয়?

ম্লান হেসে তিমির বলল, ওঃ, এই কথা।

হ্যাঁ, এই কথা, কিন্তু হাসির কথা নয়। আমি তো সমীরের কাছে সব কথা শুনে ভেবেই পাই না হাসব না কাঁদব। তুমি এ দুর্দশার পথে নেমে এলে কোন্ দুর্দৈবের ফলে?

সে অনেক কথা। আজ থাক। আর একদিন বলব।

তা না হয় বলো। কিন্তু তোমার মা-বাবা কোথায়?

মা পরলোকে। তোমাদের শহর থেকে চলে যাবার পরই হঠাৎ কলেরা হয়ে মা মারা যান।

কিন্তু তোমার বাবা?

বাবা রিটায়ার করে দেশের বাড়িতেই আছেন।

তিনি জানেন তুমি এভাবে এখানে আছ?

না।

অর্থাৎ ঝগড়া করে পালিয়ে এসেছ বাড়ি থেকে?

অনেকটা তাই।

কিন্তু কেন?

বলেছি তো সে অনেক কথা। আর একদিন বলব।

বেশ। কিন্তু আর একটা প্রশ্নের জবাব দেবে কি?

বলো।

বি, এ, টা নিশ্চয় পাশ করেছিলে?

হ্যাঁ।

আর এম, এ?

সেটা পড়তে পড়তেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। কেন সেটা জিজ্ঞাসা করো না।

বেশ। কিন্তু বি, এ, পাশ করেও এই কারখানার মজুরিতে

ঢুকেছিলে কেন ? আরও তো অনেক চাকরি আছে দেশে ?

তা হয় তো আছে। কিন্তু আমার কপালে তাদের শিকে ছিঁড়ল না।

বুঝতে পারলাম না।

তাহলে শোন, আদ্যোপান্তই বলছি। নিঃসম্বল অবস্থায় কলকাতায় এসে চাকরির চেষ্টা করলাম অনেক। কিন্তু কোন ফল হল না। ভাগ্যক্রমে জুটে গেল একটি প্রাইভেট ছাত্র। মাসিক বেতন কুড়ি টাকা। তাই সম্বল করেই ভাসতে লাগলাম বেকার-সাগরে। কিন্তু সেই নাবালক ছাত্রকে ডেমন্সট্রেটিভ্ অ্যাডজেকটিভ আর পার্শিং পড়ানো ধাতে সইল না। আবার পুরোপুরি বেকার হলাম। ক্রমে দেখা দিল অনশনের কালোছায়া। তারই তাড়নায় একদিন ঢুকে পড়লাম এই কারখানায়। ক্রমে সেখান থেকে প্রমোশন পেলাম আপিসে। অবশ্য সেটা প্রমোশন কি ডিমোশন তা বুঝতে পারছি না। তবে দিন এক রকম কেটে যাচ্ছে।

তিমির চুপ করল। অশ্রুও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইল।

একটু পরে ঘাড় তুলে অশ্রু বলল, সমীরের কাছে শুনেছি, আমাদের এ বাড়িতে এসে থাকতে তোমার খুব আপত্তি। তাই কি ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন ?

তোমাকে অনুরোধ করছি, সে-প্রশ্নটাও তুমি করো না।

বেশ। কিন্তু আমি একটা অনুরোধ করব, রাখবে কি ?

না শুনে কি করে জবাব দেব ?

একদিন কিন্তু দিতে পারতে। যাক সে কথা। শোন, আমি যখনই খবর পাঠাব এ বাড়িতে এসে তুমি খেয়ে যাবে। বলো, আমার এই অনুরোধটা রাখবে ?

তোমার কি মনে হয় আমি খুব রোগা হয়ে গেছি ?

তার মানে ?

মানে হোটেলের খাবার আরও কিছুদিন খেলেই আমি মারা যাব এ আশংকা—

আতংকে শিউরে উঠে ধমকে উঠল অশ্রু, চুপ করো তিমিরদা, ঠাট্টারও একটা সীমা আছে।

হাল্কা পরিহাসের সুর দিয়ে অশ্রুর প্রস্তাবটাকে চাপা দিতে চেয়েছিল তিমির। কিন্তু সেটা যে এমন একটা অবাঞ্ছিত পরিনতিতে যেয়ে দাঁড়াবে সেটা সে ভাবতে পারে নি। অশ্রুর আতংকিত কণ্ঠস্বরে সে সম্বিৎ ফিরে পেল। কোন কথা না বলে অশ্রুর দিকে অপরাধীর মত তাকাল।

অশ্রু বিক্ষুব্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, আজ আমি যতই বদলে যেয়ে থাকি, তবু আমি মেয়ে মানুষ এ সত্যটা তুমি যেন আর কখনও ভুলে যেয়ো না তিমিরদা। আর আমার অনুরোধ ? আমার অনুরোধ আমি করলাম, সেটা রাখা না রাখা তোমার ইচ্ছা।

একটু চুপ করে থেকে অশ্রু বলল, তাছাড়া সমীরের সব উন্নতির মূলেই তো তুমি। তাই তোমার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতারও তো অন্ত নেই। তোমাকে দুচার দিন খাইয়ে তোমার সে ঋণ যদি কিছুটা শুধতে চাই তাতেই বা তুমি আপত্তি করবে কেন ?

তিমির এবার আহত কণ্ঠে বলল, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তুমি যখনই ডাকবে আমি আসব। কিন্তু দোহাই তোমার, আর আঘাত আমাকে দিও না। পুরুষ মানুষও তো মানুষ। তারও তো রক্ত-মাংসের শরীর। আঘাতে সেও তো বেদনা বোধ করে।

দুটি ছলছল চোখ তুলে অশ্রু তাকাল তিমিরের দিকে। দেখল, তিমিরের দুটি বিষন্ন ম্লান চোখেও যেন অশ্রুর জোয়ার। অপলক চোখে সেও চেয়ে আছে তার দিকে।

কতকাল—কতকাল পরে চারটি চোখ আবার বুঝি পথ হারাল অন্তরের অতলান্ত গভীরে।

আর একদিন।

সকালে চা খেতে খেতে অশ্রু ডাকল, সমীর!

স্বরে একটা ব্যথার আভাষ পেয়ে সমীর দিদির মুখের দিকে চাইল।

ভাখ সমীর, এই ত সকালে উঠে তুই চলে যাবি কাজে, ফিরবি সেই সন্ধ্যায়। সারাটি দিন আমার একলা মন একটি সাথীর জন্য ছটফট্ করে। তাই—

নাঃ তোমার সঙ্গে আর পারবি না দিদি। তুমি আবার সেই পুরনো কথা তুললে তো?

সমীর হেসে উঠল।

হাসবার কথা নয় সমীর। জীবনের অনেক দুঃখ অনেক ব্যথা আমি সয়েছি শুধু তোরই মুখ চেয়ে। আজ তোর সময় হয়েছে। বিয়ে করে তুই সংসারী হ ভাই, তাতেই আমার সুখ-শান্তি।

সমীর চুপ করে রইল।

মনে পড়ল—দিদির ব্যর্থ জীবনের কথা, অকাল বৈধব্যের বঞ্চনার কথা!

অশ্রু আবার বলল, তা হলে তুই কথা দিলি?

সমীর উত্তর দিল, আমায় ক্ষমা কর দিদি।

অশ্রু কথা কইল না। অভিমানে চুপ করল।

সমীর বলল, ভাই-বোনে বেশ ত আমাদের দিনগুলি কেটে যাচ্ছে, কেন এর মধ্যে আর একটি মানুষকে টেনে এনে বৃথা জঞ্জাল বাড়াবে?

জঞ্জাল বাড়বেই একথা তোকে কে বল্লে?

বলে নি আমাকে কেউ। এ আমার কেমন যেন দৃঢ় বিশ্বাস যে,

আমাদের এ সংসারটি শুধু ভাই-বোনের জন্য। আর কেউ এখানে আসন পাতলেই আমাদের শান্তির নীড়ে ঝড় উঠবে।

এ তোর নিছক কল্পনা, এর সঙ্গে সত্যের কোন যোগ নেই সমীর।

সমীর জবাব দিল, কল্পনার নীচেও সত্যের গোপন ভিত্তি থাকে। ভেবে দেখ দিদি, আর একটি মানুষকে বিয়ে করে আনলে আমি ত আর সব সময় তোমার কোলে মাথা রেখে শুতে পারব না।

অশ্রু হেসে বলল, দূর বোকা, তুই যে চিরদিন আমার ভাই-ই থাকবি।

সমীর বলল আপত্তির সুরে, তা হলে দিদি, আর একজন যে আসবে তার অধিকার যে লাঞ্ছিত হবে পদে পদে। কেন এই অকারণ বঞ্চনার বোঝা বাড়াব ?

সমীরের তার্কিক মন আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিল।

বাধা পেল তিমিরের অকস্মাৎ আবির্ভাবে।

হাসতে হাসতে বলল তিমির, ভাই-বোনে ত বেশ আসর জমিয়েছ। এদিকে আমার যে গলা শুকিয়ে গেল।

অশ্রু উঠে বলল, তুমি বস তিমিরদা, আমি এখনই চা নিয়ে আসছি।

অশ্রু ভিতরে চলে গেল।

চেয়ার টেনে নিয়ে তিমির বলল, এত কি কথা হচ্ছিল সমীর ?

সমীর হেসে উত্তর দিল, শুনেছ দাদা, দিদির ভারী সখ হয়েছে একটি বউ আনবে।

তুমি নিশ্চয় অমত করেছ ? মত দিলেই ত ভাল হত। নিজের মনপ্রাণ ত যন্ত্র-দানবের পায়েই বিলিয়ে দিয়েছ। তোমাকে ঘিরে আর কেউ যে একটু আনন্দ পাবে, তা কেন তুমি নষ্ট করে দেবে ?

তিমিরদা, একে ত আমার অবসর মোটেই নেই। কাজকেই যে শুধু চিনেছে জীবনে, স্বাভাবিক সংসার-ধর্ম তাকে আনন্দ দিতে পারে না।

তুমি বল কি সমীর? কাজের লোক যারা, দুনিয়ায় তারা কি বিয়ে করে না, না ক'রে তারা অসুখী হয়?

দেখ তিমিরদা, সংসারে আপনার বলতে এক দিদি। তার সকল জীবন যখন এমন করে ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে কেটে যাচ্ছে, তখন তার ভাই হয়ে তারই চোখের সামনে আমি ভোগের পথে পা বাড়াব কোন্ প্রাণে?

সমীরের গলা ভারী হয়ে এল।

কোন কথা আর বলল না কেউ। সব স্তব্ধ!

একটা পাগলা বাতাস এসে দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারটার উপর আছড়ে পড়তে লাগল।

সমীর একটু পরেই উঠে পড়ল। বলল, ছোট সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে তিমিরদা, আমি উঠলাম। শীগগিরই ফিরব।

একটু পরেই ঘরে ঢুকল অশ্রু। হাতে চা-জলখাবার।

অশ্রুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে তিমির বলল, সমীর এখুনি বেরিয়ে গেল। জরুরী কি কাজ নাকি আছে ছোট সাহেবের বাড়িতে। শীগ্‌গিরই ফিরবে।

অশ্রু কোন কথা বলল না। চা-জলখাবারটা এগিয়ে দিল নীরবে। চুপচাপ বসে রইল।

চা-জলখাবার পর্ব শেষ হয়ে গেল। আবার স্তব্ধতা। বাতাসের আকুলতা। মানুষের বুকের কান্না যেন তাতে ধ্বনিত হচ্ছে।

আকাশের গুরু গর্জ্জনে উভয়েরই চমক ভাঙল। তিমির দাঁড়িয়ে বলল, সমীর যে অনেকক্ষণ চলে গেছে। এদিকে জলও এসে পড়ল। সমীর এলে বল বিশেষ প্রয়োজনে আমি চলে যাচ্ছি।

অশ্রু ডাক্‌ল, দাঁড়াও তিমিরদা।

সে ডাকে ছিল অস্বাভাবিক কিছু, তিমির ফিরল।

এত দিনেও সঙ্কোচের বাধা তুমি এড়াতে পারছ না তিমিরদা।

আমার সঙ্গে কথা বলতে হলেই উদ্দেশ্যে বলো! আমার নাম ধরে পর্যন্ত ডাক না।

জবাব দিতে যেয়েও কেন যেন মুখ নিচু করল তিমির। কেমন যেন বিব্রত বোধ করতে লাগল। তারপর মৃদু গলায় বলল, মানে—ব্যাপার হল—অনেক ভেবেচিন্তেও সম্বোধনের ভাষাটা ঠিক কি হবে কিছুতেই বুঝে উঠছি না।

বিস্মিত হল অশ্রু। ব্যথিতও হল। বলল, কিন্তু একদিন তো এ সমস্যা তোমার ছিল না।

মুখ তুলে তিমির বলল, সেদিন আর এদিনের মধ্যে যে অনেক ব্যবধান।

কিন্তু কে দায়ী এ ব্যবধানের জন্য? তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল অশ্রু।

আমি—আমি দায়ী, সে কথা আমার চেয়ে কেউ তো বেশী করে জানে না! তবু যতবারই চেষ্টা করি তোমার নাম ধরে ডাকতে, একটা সংস্কারের বাধা এসে মুখ আটকে ধরে।

কিছুক্ষণ দুজনই চুপচাপ।

একদৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল অশ্রু।

এক সময় হঠাৎ তিমির বলল, কি ভাবছ এক মনে?

ভাবছি যে, মানুষের অন্তর বড়, না তার সংস্কার বড়, এর কোন্‌টার দাবী জীবনের ওপর বেশী।

দাবী হয়ত অন্তরেরই বেশী। কিন্তু সমাজ ছাড়া মানুষের জীবন চলতে পারে না, তাই তাকে সংস্কারকে মেনেই চলতে হয়।

অশ্রু বাধা দিল, তাতে যদি কারও অন্তর পুড়ে ছাই হয়, তবু?

এ প্রশ্নের একটা সাধারণ উত্তর দেওয়া ত খুব সোজা নয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও আবহাওয়ায় এর ভিন্ন সমাধান।

ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সে বিদ্যাও আমার নেই। তবে আমার মনে হয়, অন্তরের দাবী বড় হলেও সংস্কারের বিরুদ্ধে তাকে প্রকাশ না করে অন্তরের আলোতে

তাকে পূর্ণ করাই শ্রেয়। প্রাণের মূল্য তাতে ক্ষুন্ন ত হয়ই না, বরং বাইরের পাওনার চেয়ে অনেক বেশী পায়।

তাহলে তুমি বলতে চাও, সব অবস্থাতেই সমাজকে মেনে চলতে হবে—যত কঠোরই হোক তার বিধান?

সে কথা আমি বলতে চাই না। আমার কথা এই যে, অন্তরের দাবী সমাজের বিরুদ্ধে পূর্ণ করে নিতে বুকের যতখানি সামর্থ্য, অন্তরের যতখানি শুভ্রতা ও মহত্বের প্রয়োজন, অনেক মানুষেরই তা থাকে না। ফলে এই দাঁড়ায় যে প্রাণের দাবী পূর্ণ করতে গিয়ে সমস্ত প্রাণটাই দূষিত হয়ে পড়ে।

কিন্তু প্রাণের আকুল তৃষ্ণার আবেগে কেউ যদি সমাজকে ছেড়ে গিয়ে শান্তির আস্বাদ পায়, তাহলে তার কাজকে ত দোষ দেওয়া চলে না।

দোষের কথা ত আমি বলি নি। বরং অন্তরের সম্ভ্রম বজায় রেখে কেউ যদি সমাজের একটা অন্যায়কে নষ্ট করে দিতে পারে সে তো তার মহত্ব।

অশ্রুর মুখে একটা বেপরোয়া ছবি ফুটে উঠেছে। যেন ওর মাঝে চলেছে সংগ্রাম, এমনই ভাবে ও শুধাল সহসা, সে মহত্বকে নিজের জীবনে তুমি বরণ করে নিতে কি পার না তিমিরদা?

বিস্মিত চোখ তুলে ওর দিকে চাইল তিমির। তিমিরের শিরায় রক্তের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছে। জবাব দিতে গিয়ে ও হঠাৎ থমকে গেল। হঠাৎ আনা হাসির সঙ্গে বলল, ব্যক্তিগত সম্পর্ক টেনে আনলে সমালোচনার রস আহত হয়। পারা না পারার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধই নাই। তা এ সম্বন্ধে না হয় আর একদিন কথা পাড়া যাবে, আজকের মত আমি উঠছি, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

উত্তরের কোন অপেক্ষাই না করে তিমির বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অশ্রু স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

কতক্ষণ যে সেইভাবে বসেছিল, অশ্রুর খেয়ালই ছিল না। মনের

কোন্ গহনে সে যেন তলিয়ে গিয়েছিল। বাইরে সদর দরজায় মোটরের হর্ণ শুনে তার চমক ভাঙল।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। সেই দিকে এগিয়ে যেতেই দেখল, বাইরে অবিরাম বৃষ্টি চলেছে তখনও। আর সেই বৃষ্টির মধ্যেই একটা ট্যাক্সি থেকে নামছে সমীর।

এতক্ষণে অশ্রুর যেন খেয়াল হল, তাহলে তিমিরও কি মুষলধারা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই গিয়েছে? অথচ সে তাকে একটু বসে যেতে পর্যন্ত বলে নি?

প্রায় দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল সমীর। রুমাল দিয়ে মাথাটা মুছতে মুছতে বলল, বাব্বা! কী বৃষ্টি! গেটটুকু পার হতেই একেবারে ভিজে গেছি।

অশ্রু বলল, ও রুমালের কাজ নয়। বাথ-রুম থেকে তোয়ালে দিয়ে ভাল করে গা-মাথা মুছে আয়। আমি তোর জন্যে চায়ের কথা বলে আসি।

ঘর থেকে যেতে যেতেই সমীর বলল, দাদা বুঝি চলে গেছে?

হ্যাঁ। সে তো অনেকক্ষণ চলে গেছে।

ইস্, তুমি তাকে এত তাড়াতাড়ি যেতে দিলে কেন দিদি? সুখবরটা তাকে এখুনি শুনিয়ে দিতে পারতাম।

কী সুখবর রে?

সেটা চা খেতে খেতে বলব। আগে জামা-কাপড়টা ছেড়ে আসি।

চা খেতে খেতে সব কথাই শুনল অশ্রু। সমীরের কথাবার্তায় এই রকমটা আন্দাজ সেও করেছিল মনে মনে। শুধু ঘটনাটা এতই অবিশ্বাস্য যে মুখ ফুটে সে বিষয়ে সমীরকে কোন দিন জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পায় নি।

সুখবরই বটে। খবরটা শুনে অশ্রু খুশিও হল। সঙ্গে সঙ্গে

একমাত্র ভাইয়ের আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় তার বুকটাও যেন টন টন করতে লাগল।

বাবা-মার মৃত্যুর পর থেকে এতটুকু সমীরকে সেই তো কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। সেই সমীর আজ তাকে ফেলে রেখে দীর্ঘদিনের জন্য কোন্ সুদূর দেশে পাড়ি জমাবে, সে কথা ভাবতেও আশংকায় ও ব্যাকুলতায় অশ্রুর বুকের ভিতরটা তোলপাড় করতে লাগল।

সমীর বলল, তুমি কিচ্ছু ভেব না দিদি, আমি সব 'ম্যানেজ' করে নিতে পারব। তাছাড়া মলিও তো যাচ্ছে আমার সঙ্গে।

মলি!

বারে! ছোট সাহেব মানে মিঃ মজুমদারের সেই তো 'কণ্ডিশান' আমাকে ইওরোপ পাঠাবার। জাহাজে উঠবার আগে মলিকে বিয়ে করে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে ওয়েস্ট জার্মেণীতে।

মিঃ মজুমদারের আদরিণী কন্যা মলির সঙ্গে সমীরের যে পূর্বরাগের মত একটা ব্যাপার চলেছে, এমনি একটা সন্দেহ অশ্রুর মনে অনেক বারই উঁকি দিয়েছে। কিন্তু সেটা যে সত্যি যে কোনদিন বিবাহে রূপ পাবে, আর পেলেও এত তাড়াতাড়ি পাবে সেটা অশ্রু কখনও ভাবতেও পারে নি। তাই খবরটা শুনে অশ্রুর খুবই আনন্দিত হবার কথা হলেও সে যেন তার আকস্মিকতায় কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ল।

কিন্তু-কিন্তু গলায় বলল, ওরা শুনেছি খুব বড় লোক। বাড়িতে কত চাকর-বাকর বয়-খানসামা। ওঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ করলে আমরা কি তাল সামলাতে পারব?

তুই তুড়ি মেরে অশ্রুর সব আশংকাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে সমীর বলল, এ তোমার বাজে ভয় দিদি। শুধু বাইরেটা দেখেই কি মানুষকে ঠিক-ঠিক বিচার করা যায়? মিঃ মজুমদার কত ভাল লোক। বলতে গেলে আমাকে তো তিনি হাত ধরে টেনে তুলেছেন। তাঁরই একান্ত চেষ্টায়ই তো কোম্পানীর এই অফারটা আমার কাছে এসেছে।

নইলে এতদিন কোন পাঁকে তলিয়ে যেতাম বল তো ?

তাতো ঠিকই। তবু—

এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই দিদি, সব একেবারে পাক্কা। আমি ওঁদের কথা দিয়ে এসেছি। এখন বিয়ের দিন দেখা আর জাহাজের 'প্যাসেজ' বুক করতে যা দেরি।

সমীরের গলার স্বর খুশিতে একেবারে ডগমগ। তার এই ধরনের কথাবার্তায় অশ্রু যে মোটেই খুশি হতে পারছে না সেটা চেয়ে দেখবার বা বুঝবার অবসরই তার তখন নেই। নিজেই খুশিতে সে মিঃ মজুমদার ও মলির গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

ধীর গলায় অশ্রু এক সময় বলল, কিন্তু সমীর, এত বড় একটা ব্যাপারে ওঁদের পাকা কথা দেবার আগে আমাদের মতামতটা একবার জিজ্ঞাসা করা তোমার উচিত ছিল।

নিশ্চয় ছিল, সমীর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল। তবে কি জান দিদি, যাতে আমার এতবড় একটা উপকার হবে তাতে যে তোমার সম্পূর্ণ মত আছে তা আমি নিশ্চিত জানতাম। তাই এক কথাতেই আমি রাজী হয়ে এসেছি।

একটু ইতস্তত করেও শেষ পর্যন্ত অশ্রু বলল, কিন্তু তোমার দাদা ? সেও তো তোমার শুভাকাঙ্খী। তাঁর মতামতটা তোমার একবার শোনা উচিত ছিল।

তিমিরের প্রসঙ্গ উঠতেই কেমন যেন একটু রুষ্ট হয়ে উঠল সমীর। অসহিষ্ণু গলায় সে বলল, অন্তত এ ব্যাপারে দাদার কথা আর তুমি তুলো না দিদি।

কেন ?

দেখ, দাদা লোক খুব ভাল, আমার জন্য তিনি করেছেনও অনেক। কিন্তু কি জান, আমি যে মিঃ মজুমদারের বাড়ি যাই-আসি, বা মলিদের সঙ্গে মিলিমিশি এটা দাদার মোটেই পছন্দ নয়।

গম্ভীর গলায় অশ্রু বলল, কি করে জানলি ? সে কিছু বলেছে ?

না, মুখ ফুটে কিছু বলে নি। তবে আমি বুঝতে পারি। আসলে কথা কি জান, মিঃ মজুমদারের কৃপায় আমি যে হঠাৎ একেবারে এতটা উপরে উঠে এসেছি এটাকে দাদা ঠিক ভাল মনে গ্রহণ করতে পারে নি। হয় তো মনে মনেও একটু ঈর্ষাই হয়েছে তাঁর।

দুই দাঁতে নিম্নোষ্ঠটি চেপে ধরে আত্মসংবরনের চেষ্টা করছিল অশ্রু। কিন্তু পারল না। সমীরের কথা শেষ হতে না হতেই সে কর্কশ গলায় বলে উঠল, সমীর!

চমকে উঠল সমীর। অশ্রুর রোষকম্পিত মুখের দিকে চেয়ে আরও অবাক হয়ে গেল। বলল, কি হল দিদি? হঠাৎ এমন রেগে গেলে কেন? যা সত্যি আমি তাই বলেছি।

দৃঢ় কণ্ঠে অশ্রু বলল, না, সত্যি নয়। তিমিরদাকে তুমি চেন না। তুমি যা ভেবেছ তার চেয়ে সে অনেক অনেক বড়।

আহা, সে কথা কি আমি অস্বীকার করছি। তবে মলিদের ব্যাপারে সে যেন—

বাধা দিল অশ্রু, থাক। তোমার সঙ্গে সে তর্ক করে কোন লাভ নেই। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।

কথা শেষ করেই দ্রুত পায়ে ঘর থেকে ভিতরে চলে গেল অশ্রু।

সমীর প্রথমটা আহত হল দিদির আকস্মিক রূঢ়তায়। কিন্তু একটু ক্ষণ ভাবতেই অশ্রু ও তিমিরের মধ্যে একটা গভীরতর ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার করতে পেরে মনে মনে সে খুশি হয়ে উঠল।

বাইরের বৃষ্টিঝরা অন্ধকারের দিকে চেয়ে হঠাৎ সে নিজে নিজেই হেসে উঠল।

ভাবল: এ ভালই হল। দিদিকে একা একা রেখে যেতে মনে তার উদ্বেগের সীমা ছিল না। সে ভয় আর রইল না। তিমিরদাই তো রইল।

তেরো ॥

সমীরের বিয়ে হয়ে গেল।

আদরের ছোট ভাইটির বিয়ে দিয়ে টুকটুকে একটি বৌ ঘরে এনে তার সঙ্গে হেসে-খেলে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দেবার যে-স্বপ্ন অশ্রু দেখেছিল, বিয়ের পর মাত্র কয়েকটি দিন মলিকে দেখেই তার সে-স্বপ্ন ধূলায় গুড়িয়ে গেল।

বিয়ের পরে এ-বাড়িতে এসে গাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই নব-বিবাহিত বর-কনে অশ্রুর সামনে এসে দাঁড়াল।

মাথা হেঁট করে দিদিকে প্রণাম করে সমীর বলল মলিকে উদ্দেশ্য করে, আমার দিদি, প্রণাম কর।

হাত বাড়িয়ে পা ছুঁয়ে কোন রকমে প্রণাম একটা অবশ্য মলি করল অশ্রুকে। কিন্তু তার চোখে তখন বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার যে কালো রেখাগুলো ফুটে উঠতে দেখল অশ্রু, তাতেই তার মনের বহুদিনলালিত টুকটুকে একটি কিশোরী বঁধূর স্বপ্ন-ছবি ভেঙে মুহূর্তে ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল।

এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তিমির। মনের অনেক সংকোচ সত্বেও সমীরের জীবনের এই শুভক্ষণটিতে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে নি সে। বিশেষতঃ অশ্রুর একান্ত অনুরোধকে উপেক্ষা করতে সে পারে নি। তাই এই বিবাহকে কেন্দ্র করে তার মনে যতই অপ্রসন্নতা জমে উঠুক না কেন, নবদম্পতিকে তাদের নিজের ঘরে সাদরে বরণ করে নেবার সময়টিতে অশ্রুর পাশে এসে তাকে দাঁড়াতেই হয়েছিল।

দাঁড়াতে হয়েছিল অশ্রুর জন্যই। অশ্রুই বলেছিল, আমাকে তুমি এড়িয়ে চলেছ তাতে আমি বাধা দেই নি। কিন্তু সমীরের জীবনের এই শুভক্ষণটিতে তুমি দূরে সরে থেক না। এত বড় পৃথিবীটাতে ওরা যে একেবারেই একা নয়, বিপদে-সম্পদে ওদের পাশে দাঁড়াবার জন্য এই অক্ষম দিদি ছাড়া অন্তত আর একটি শুভাকাঙ্খী মানুষও যে রয়েছে এ নির্ভরতাটুকু থেকে ওদের তুমি বঞ্চিত করো না।

এগিয়ে এসে তিমিরকে প্রণাম করল সমীর। বলল, আমার দাদা, প্রণাম কর।

এক পলক তিমিরের মুখের দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল মলি। যেন একান্ত তাচ্ছিল্য ভরেই কোন মতে হাত দুটো তুলে ছোট্ট একটু নমস্কার করলমাত্র।

নববঁধূর ব্যবহারের এই অসৌজন্য অশ্রুর দৃষ্টি এড়াল না। তিমিরের অসম্মানাহত মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় ও সংকোচে তার চোখ-মুখও আরক্ত হয়ে উঠল।

তারপর আর সামান্য কিছুক্ষণমাত্র সেখানে অপেক্ষা করেই চলে গিয়েছিল তিমির। যাবার বেলায় অশ্রুকে বলেছিল, এরপর তো স্ত্রী-আচার ছাড়া আর কিছু করবার নেই, পুরুষমানুষ এখন অবান্তর। আমি এবার চলি।

এত তাড়াতাড়ি কেন যে তিমির চলে যেতে চাইছে, অশ্রুর সেটা অজানা নয়। তবু মুখ ফুটে সে বিষয়ে কোন কথা বলবার তার প্রবৃত্তি হল না। মুখ নিচু করে শুধু বলল, আচ্ছা। আবার এস কিন্তু কাল। অল্প হলেও কিছু লোকজনকে তো খেতে বলা হয়েছে। আমি একা সব দিক সামলাতে পারব কেন?

পরদিনও এসেছিল তিমির। বিয়ে-বাড়ি থেকে নিজেকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন রেখে একান্ত নিস্পৃহ ভাবে কাজ-কর্ম যতদূর যা করা সম্ভব তাও করল। রাত একটু গভীর হলে অশ্রুকে ডেকে এক সময়

বলল, এবার তাহলে আমি চলি। দরকার বোধ করলেই আমাকে ডেকে পাঠিও।

গম্ভীর মুখে অশ্রু বলল, তার মানে বিনা দরকারে বিনা ডাকে তুমি আসবে না?

কি ছিল অশ্রুর গলার স্বরে। চমকে তিমির বলল, কি বলছ তুমি?

আমি যে অথৈ সাগরে পড়ে গেলাম তিমিরদা।

মানে?

একদিন এ বাড়িতে এসেই নতুন বৌ যে আমাকে অস্বীকার করছে। এরপরে তাহলে এ সংসারে আমি থাকব কেমন করে?

তোমার কথা তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কি হয়েছে খুলে বল।

সবই বলল অশ্রু।

দুপুরে আনুষ্ঠানিক বৌ-ভাতে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করেছিল অশ্রু। তিমিরকেও করেছিল। আপিস কামাইয়ের অজুহাতে সে আসে নি। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে সেই নিমন্ত্রিতদের সামনে ঘি-ভাতের থালা নিয়ে মলিকে পরিবেশন করতে বলেছিল অশ্রু। তাতে সে কিছুতেই রাজী হয় নি। বরং অশ্রুর মুখের উপর বলে দিয়েছে যে, তার বাপের বাড়িতে কখনও ঝি-চাকরের অভাব হয় নি যে এক দঙ্গল লোকের সামনে হাতা নেড়ে ভাত বেড়ে দিতে হবে। ও সব গেঁয়ো ব্যবস্থা মত সে কাজ করতে পারবে না। এ কথার পরে আর সেখানে দাঁড়ায় নি অশ্রু। মুখ নিচু করে নিঃশব্দে নিজের ঘরে যেয়ে বিছানায় শুয়ে নীরবে কেঁদেছিল শুধু।

ঘটনাটা বলতে বলতে অশ্রুর দুই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে বলল, বল তো এখন আমি কি করি?

তিমির একটু চুপ করে থেকে বলল, এই রকম একটা কিছু ঘটবে

আমিও আশংকা করেছিলাম। কিন্তু হাতের তীর যখন একবার ছোঁড়া হয়ে গেছে তখন আর এ নিয়ে ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি বল? ওরা যেভাবে চলতে ভালবাসে সেই ভাবেই চলুক। নিজেকে আর তুমি ওর মধ্যে জড়াতে যেয়ো না। তাতে বৃথাই কষ্ট পাবে।

কষ্ট আমার সাথের সাথী সে আমি জানি তিমিরদা। আমি শুধু ভাবছি শেষ পর্যন্ত সমীর আমার পর হয়ে যাবে?

তিমির হেসে বলল, এইখানে তুমি একটু ভুল করলে।

ভুল?

হ্যাঁ ভুল। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে এখন আর সমীর শুধু তোমার ভাই নয়, সে একজনের স্বামীও। তাও আবার এমন এক জনের স্বামী যার প্রতি সমীরের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

কিন্তু আজ সে স্বামী হয়েছে বলে আমার এতদিনকার দিদি হওয়াটা একেবারেই মিথ্যে হয়ে যাবে?

মিথ্যে হওয়া অবশ্য উচিত নয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে তা যদি হয়েই যায় তাহলে তা নিয়ে নালিশ করবে তুমি কার কাছে?

অশ্রু এ-প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অসহায় ভাবে বলল, কিন্তু তিমিরদা, আমি তাহলে যাব কোথায়?

তিমির হেসে বলল, সে কথা ভাববার দিন এখনও আসে নি। আর কদিন বাদেই ওরা বিদেশে যাচ্ছে। সেখানে কম করে হলেও বছর দুই তো থাকবে। তারপর ফিরে এসে কি অবস্থা দেখা দেয় সে তখন বোঝা যাবে।

নববধূর ব্যবহারে অশ্রুর স্পর্শকাতর মনটা বড় বেশী আহত হয়েছিল। তাই কোন কিছুতেই যেন সে সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছিল না। মুখ তুলে বলল, বোঝাবুঝির আর কিছু বাকি নেই তিমিরদা। হাঁড়ির ভাত একটা টিপলেই সব বোঝা যায়। আমার ভাত এখানে ফুরিয়ে গেছে। সে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।

বেশ তো, তেমন দুর্দিন যদি সত্যি আসে, তোমার দুটি ভাতের ব্যবস্থা সেদিন হবেই।

কিন্তু কোথায় হবে?

কেন? আমার হাঁড়িতে? পারবে না সেদিন এক হাঁড়ি থেকে ভাগ করে খেতে?

তিমিরদা!

কী একটা অজ্ঞাত বেদনায় যেন সহসা চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল অশ্রু। একই সঙ্গে বিষ আর অমৃতের দুটি ধারা কে যেন প্রবাহিত করে দিল তার কর্ণকুহরে।

এ কী আনন্দ! এ কী বেদনা!

তিমির তাকে ডাক দিয়েছে। পৌষ তাকে ডাক দিয়েছে। রাতের আঁধার তাকে ডাক দিয়েছে।

কিন্তু হায়রে! পথ যে অবরুদ্ধ আঁধারে যে ঢেকে গেছে পথ-রেখা! কেমন করে সে সাড়া দেবে? কোন্ পথে সে পা ফেলবে?

নিজেকে সামলে নিয়ে অশ্রু যখন মুখ তুলে তাকাল, তার পাশে তখন কেউ নেই। তিমির চলে গেছে।

বাড়ির সামনের রাস্তার উপরে উচ্ছিষ্ট আহার্যের স্তূপের উপর কয়েকটা কুকুরের কুৎসিৎ ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু।

অশ্রুর দুই চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নামল। লক্ষ্যহীন দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে চেয়ে রইল সে।

মন নিয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে আরও একদিন ঠিক এমনি ভাবে একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল ওরা।

ইওরোপ যাত্রার পথে হাওড়া স্টেশনে সমীর আর মলিকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এক সঙ্গেই সমীরের শহরতলির বাসায় ফিরে এসেছিল অশ্রু আর তিমির।

গেট থেকেই বিদায় নিতে চেয়েছিল তিমির।

অশ্রু বলল, তা কি হয়? এতদূর যখন এসেছ একটু চা খেয়ে যাও।

তবু একটু ইতস্তত করেছিল তিমির।

হেসে অশ্রু বলল, ও হরি! এই ভাবে তুমি আমার দেখাশুনা করবে না কি? সমীর যে তোমার উপরেই আমার সব ভার দিয়ে গেল।

তিমিরও হাল্কা সুরে বলল, আমি তো ভার বইতে তৈরিই আছি; কিন্তু যার ভার সে বইতে দিলে তো?

হুঃ, ভার বইতে যে তুমি কত তৈরি আছ সে আর আমার জানতে বাকি নেই। কিন্তু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আর কথা নয়। ভিতরে চল।

চা খেয়ে অল্পক্ষণ পরেই ফিরে গেল তিমির।

যাবার সময় অশ্রু বলল, আমি বড্ড একা থাকব তিমিরদা। সময় পেলেই একটু খোঁজ-খবর নিও। আমার ডাকের অপেক্ষা করো না।

আচ্ছা—বলে হেসে পথে নামল তিমির।

অশ্রু অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল তার অপসৃয়মান দেহটার দিকে। তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

ভার। অশ্রুর ভার! সে-ভার বইতে কি আজ তুমি সত্যি তৈরি হয়েছ?

যদি বা হয়েই থাক, সে-ভার যে আজ দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠেছে সে খবর কি তুমি রাখ না?

তুমি কি জান না তোমার-আমার মাঝখানে আজ দুর্লংঘ্য খরস্রোত ব্যবধান?

তবু—দুর্বার দুঃসাহাসিক মানুষের মন।

কোন বাধাই বুঝি তার কাছে দুর্লংঘ্য নয়—অনতিক্রমণীয় নয়।

তিমির মাঝে মাঝেই সমীরের বাসায় যায়।

মনকে বোঝায়—সমীরের অবর্তমানে অশ্রুর খোঁজ-খবর নেওয়া, তার সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা, অশ্রুর জীবনের নিঃসঙ্গ একঘেয়েমিকে শুভাকাঙ্খীর সাহচার্য দিয়ে ভরিয়ে তোলা—তার একান্ত কর্তব্য। সে কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন না করলে অশ্রুই বা কি ভাববে, আর সমীরই বা কি মনে করবে?

কিন্তু মনের গভীরতম গভীরে বসে এক দুর্দমণীয় আকর্ষণ যে বলিষ্ঠ হাতে লাগাম টেনে টেনে তিমিরকে অশ্রু-বলয়ের চারধারে অবিরাম ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে, সে-সত্য তিমির তখনও সম্যক উপলব্ধি করতে পারে নি।

একদিন অপরাহ্ন।

আপিসের পরে তিমির সেদিন আর আস্তানায় ফিরল না। সোজা এগিয়ে চলল সমীরের বাড়ির দিকে। অশ্রুর শরীরটা একটু অসুস্থ দেখে গিয়েছে আগের দিন। তাই একটু অন্যমনস্ক ভাবে বেশ দ্রুত পদক্ষেপেই পথ চলছিল।

সমীরের বাড়ির কাছাকাছি এসে একটা লম্বা একটানা শিস্ কানে যেতেই চমকে পিছন ফিরে তাকাল।

একটা বাড়ির সামনে বসে জটলা পাকাচ্ছিল একদল তরুণ। তিমির মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই তারা সবাই একযোগে উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে হঠাৎ যেন ওদিককার একটা ভাঙা বাড়ির সৌন্দর্য-সুধাপানে অতিমাত্রায় মনযোগী হয়ে উঠল।

শিস্‌টা যে ওদেরই কারও শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে এবং তাও হয়েছে তিমিরকে লক্ষ্য করেই সেটা বুঝতে যেমন তিমিরের বিলম্ব হল না, তেমনি তার অন্তর্নিহিত কুৎসিৎ ইঙ্গিতটাকে উপলব্ধি করে তিমিরের সমস্ত মনটা বেদনায় ও বিস্ময়ে যেন রি-রি করে উঠল।

তবু যেটুকু সন্দেহ হয় তো তখনও তিমিরকে একটু স্বস্তি দিতে পারত পরমুহূর্তেই তাও নিঃশেষে মিলিয়ে গেল।

দুঃখিত ও চিন্তান্বিত মনেই আবার সামনের দিকে পা বাড়িয়ে

দিল তিমির। আর ঠিক সেইক্ষণেই একটা নতুন মন্তব্য এসে তার কানে যেন বিদ্যুতের কসা বসিয়ে দিল।

কণ্ঠস্বরে একটা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ছুরি শানিয়ে একজন বলে উঠল, বেড়ে আছ দাদা!

তিমিরের দুটো কান যেন জ্বালা করে উঠল। দ্বিতীয়বার পিছনে দৃষ্টিপাত না করে ঝড়ে তাড়া-খাওয়া শুকনো পাতার মত এগিয়ে যেয়ে গেট খুলে সমীরের বাড়িতে ঢুকে পড়ল সে।

বাইরের ছোট খোলা বারান্দাটাতেই দাঁড়িয়ে ছিল অশ্রু। বুঝিবা তিমিরের অপেক্ষাতেই ছিল।

আর একবার চমকে উঠল তিমির।

তবে কি অশ্রু সবই দেখেছে? সবই শুনেছে?

এ বাড়িতে তার প্রতিনিয়ত আসা-যাওয়া নিয়ে না জানি সে কি ভেবেছে? তারও মনে কি এ নিয়ে কোন কুৎসিৎ অভিলাষের ছবি ফুটে উঠেছে?

সভয়ে অশ্রুর মুখের দিকে তাকাল তিমির।

অশ্রু হেসে বলল, এস তিমিরদা। ভিতরে চল।

সাদর আহ্বান। সহজ সুন্দর অসংকোচ গ্রহণ। কোন সংকোচ নেই। কোন দ্বিধা নেই।

আশ্বস্ত হল তিমির। ক্ষণকাল আগেকার মসীকৃষ্ণ মেঘ বুঝি সরে গেল মনের আকাশ থেকে।

ভিতরে ঢুকতে ঢুকতেই তিমির বলল, কেমন আছ আজ?

ভাল।

মাথার যন্ত্রণাটা?

চলতে চলতেই মুখ ফিরিয়ে অশ্রু বলল, যন্ত্রণার কি আর শেষ আছে তিমিরদা? সেটা আছেই।

বিচলিত হয়ে তিমির বলল, তাহলে তো একজন ডাক্তার—

থাক। মেয়েমানুষের জন্য অত ঘন ঘন ডাক্তার ডাকতে হয় না।

তাই বলে চুপ করে থেকে অসুখে ভুগবে ?

ভোগান্তি কপালে লেখা থাকলে কি কেউ ঠেকাতে পারে তিমিরদা ? কিন্তু সে কথা থাক। তুমি বস, আমি চা নিয়ে আসছি।

চা খেতে খেতে এক সময় অশ্রু বলল, দেখ তিমিরদা অনেক ভেবে আমি দেখলাম তোমার আর এভাবে আমার কাছে আসা-যাওয়া না করাই ভাল।

আঁতকে উঠল তিমির। বলল, তুমি কি বলছ ?

আমি যা বলছি তার অর্থ তোমার না বুঝবার কথা নয়। একলা মেয়েমানুষ আমি এ বাড়িতে থাকি। আমার এখানে আসা নিয়ে তোমাকে হয় তো নানা রকম কথা শুনতে হয়। তাতে তোমারও অশান্তি, আমারও অশান্তি। কাজ কি এ অকারণ অশান্তি বাড়িয়ে ?

একটু চুপ করে থেকে তিমির বলল, বুঝেছি, আজকের ছোট ঘটনাটা তাহলে তোমার নজর এড়ায় নি ?

না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবই আমি শুনেছি। আর তোমার কাছে এটা শুধু আজকের ঘটনা হলেও আমার কাছে নতুন নয়।

বল কি ? এর আগেও ওরা তোমাকে জ্বালাতন করেছে ?

ওদের দোষ কি তিমিরদা ? আমাদের এই মেলামেশার ওই একটি মাত্র ব্যাখ্যাই তো ওদের কাছে স্বাভাবিক।

কিন্তু এ তো মিথ্যে ?

তিমিরের কথায় তার দিকে মুখ তুলে তাকাল অশ্রু। তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগল, কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যে তার বিচার কি এত সহজেই করা যায় তিমিরদা ?

মানে ?

নিজের মনের মধ্যে ডুব দাও, তাহলেই আমার কথার মানে বুঝতে পারবে। বুকে হাত দিয়ে বল তো, তুমি যে এখানে আস সে কি শুধুই আমার খোঁজ-খবর নিতে ? নেহাৎই একটা শুকনো কর্তব্যের তাগিদে ? তার বেশী কিছু নয় ?

এই সোজা প্রশ্নটা যেন জাহাজের তীব্র সন্ধানী আলোর মত সহসা তিমিরের মনের সবগুলি অলি-গলিকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করে তুলে ধরল তার চোখের সামনে।

নিজেই মনের দিকে তাকিয়ে সে নিজেই যেন কেমন চমকে উঠল। ভয়ে ভয়ে সে বলল, তুমি বিশ্বাস কর, কোন রকম অভিসন্ধি নিয়ে—

বাধা দিল অশ্রু, তোমাকে আমি চিনি তিমিরদা, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। নইলে একলা নির্জন ঘরে দিনের পর দিন তোমার সঙ্গে বসে কথা বলেছি কোন্ সাহসে? আবার আজই বা তোমাকে এখানে আসতে নিষেধ করছি কিসের জোরে? আমি যে জানি, তুমি আমাকে কোনদিন ভুল বুঝবে না।

অবাক বিস্ময়ে অশ্রুর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিমির। ধীরে ধীরে আবেগকম্পিত গলায় ডাকল, অশ্রু।

অশ্রু!

কতদিন পরে তাকে নাম ধরে ডাকল তিমির। কতকাল পরে তার কানে এল সেই প্রিয় নামে ডাকা!

অশ্রুর বুকের ভিতরটা যেন আকস্মিক জোয়ারের টানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তবু প্রাণপনে নিজেকে সংযত করে অশ্রু স্বাভাবিক গলায় বলল, বল তিমিরদা।

তিমিরদা নয়, বল তিমির! বল রাতের আঁধার!

তিমিরদা! একটু যেন কঠিন শোনাল অশ্রুর গলা। তিমিরের হঠাৎ উড়তে-চাওয়া মনের পাখা বুঝি গুলিবিদ্ধ হল। ছট্‌ফট্ করে উঠল তার মন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

তারপর ধীরে ধীরে বলল, একদিন নিজের অসহায় দুর্বলতায় যে অপরাধ তোমার কাছে আমি করেছি, তা কি তুমি আজও ক্ষমা করতে পারবে না অশ্রু?

অশ্রু নীরব—নিশ্চুপ।

আবার কথা বলল তিমির, ভেবে দেখ, আমি কত অসহায়, কত

একাকী। মা নেই। বাবা থেকেও নেই। এই নিঃসীম একাকীত্ব আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

সমবেদনায় উছলে উঠল অশ্রুর মন। দরদভরা গলায় সে বলল, কেন নিজেকে এমন একাকী করে রেখেছ তিমিরদা ?

কেন সে কি তুমি বোঝ না অশ্রু ? রাতের আঁধারের চোখ যে অশ্রুতে ভরে আছে, সে কি তুমি আজও মুছিয়ে দেবে না ?

নিচের ঠোঁটটাকে দুই পাটি দাঁতে কামড়ে ধরে কী যেন এক গভীর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল অশ্রু। তারপর বলল, আজ আর তা হয় না তিমিরদা—হয় না।

কেন—কেন হয় না ? মরীয়া হয়ে উঠল তিমির।

হয় না তার কারণ আমার এই সাদা থান, আমার মাথার উপরে মরুভূমির মত সাদা এই সিঁথি। এখানে যে আর কোন ফুল ফুটবে না, কোন ফল ফলবে না।

সংযমের সকল বাঁধ ভেঙে হঠাৎ চাপা গলায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অশ্রু।

একটি অসহায় অশ্রুমতী নারার সম্মুখে অধিকতর অসহায়ের মত চুপ করে বসে রইল তিমির।

বাইরে রাতের অন্ধকার ঘন হতে ঘনতর হয়ে নামতে লাগল।

এমন সময় বাইরের খোলা বারান্দায় দুম্ করে একটা শব্দ হল। একটা ভারী জিনিষ সশব্দে বারান্দার শক্ত শানের উপর পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

চমক ভেঙে ছুটে বাইরে বের হল তিমির।

অশ্রু যেমন বসেছিল দুই হাতে মুখ ঢেকে তেমনি বসেই রইল।

তিমির চেঁচিয়ে বলল, কে ? কে ?

দূরে অন্ধকারে কতকগুলি গলার মিলিত খিল্‌খিল্ শব্দ শোনা গেল। ওই নিষ্কর্মা ছেলেগুলো যে সারাক্ষণ তাদের উপরেই নজর রেখেছিল এবং একখানা থান্ ইট সশব্দে ছুঁড়ে দিয়ে সেই কথাটাই

তাদের জানিয়ে দিয়ে গেল, সে কথা বুঝতে তিমিরের মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব হল না।

অশ্রু যে কত বড় অসম্মানের ভয়ে কত দুঃখে তাকে এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করেছে সে সত্যটা যেন এতক্ষণে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করল তিমির। সঙ্গে সঙ্গেই তার নিজের অভিমান এবং বেদনা যেন মন থেকে অনেকখানি মুছে গেল।

ধীর পায়ে দরজার কাছে ফিরে গিয়ে সে বলল, আমি যাচ্ছি অশ্রু। বার বার আমি তোমাকে শুধু আঘাতই দিচ্ছি, আমার এ অপরাধ তুমি ক্ষমা করো।

কথা শেষ করে কোন রকম উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিমির হন্ হন্ করে গেট পার হয়ে পথে নেমে পড়ল।

উপর্যুপরি কতকগুলি অদৃশ্য গলার হাঁচির শব্দ যেন প্রাণঘাতী কামানের গোলার মত তাকে তাড়া করে নিয়ে চলল।

ওদিকে গেট বন্ধ করার শব্দে চমকে মুখ তুলে অশ্রু দেখল, তিমিরের অপসৃয়মান দেহটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

হাহাকার করে উঠল তার মন। এ সে কী করল? অধীর প্রতীক্ষায় যার আসার আশায় সে দিন গুনেছে সারা জীবন ধরে, ফিরে আসার পরম লগ্নে এ কী রূঢ় কণ্ঠে সে তাকে প্রত্যাখ্যান করল? কেন করল?

অর্থহীন বৈধব্যের একটা মিথ্যা সংস্কার?

জীবনের দাবীর চেয়ে সে কি এতই বড়?

কেন সে সংস্কারের জীর্ণ বেড়াকে সে ডিঙিয়ে গেল না? কেন সাড়া দিল না তার আহ্বানে?

অভিমান?

তার উন্মুখ জীবন-অঞ্জলিকে একদিন ফিরিয়ে দিয়েছিল তিমির। ফিরিয়ে দিয়েছিল প্রথম জীবনের অসহায় দুর্বলতায়—একটি রাসভারী পিতার যুক্তিহীন উচ্চাভিমানের তাড়নায়। তাই কি বড় অভিমানে

আজ তিমিরের উন্মুখ নিবেদনের অঞ্জলিকে সে নির্মম ভাবে প্রত্যাখ্যান করল ?

হায় অশ্রু! তুমি কি একবারও ভেবে দেখলে না যে এই প্রত্যাখ্যানের খড়্গ শুধু তিমিরের হৃদয়কেই রক্তাক্ত করবে না, এ যে তোমার অন্তরকেও অবিরাম আঘাত শতখণ্ডে ছিন্ন করে ফেলবে ? আর অসহায় অর্ধছিন্নকণ্ঠ ছাগশিশুর মত সারাটা জীবন তুমি যন্ত্রণায় ছটফট করে মরবে ?

দুঃসহ যন্ত্রণায় ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই লুটিয়ে পড়ল অশ্রু

রাতের ঘন কালো অন্ধকারের মত কালো চুলের রাশি তার দেহটাকে একেবারেই ছেয়ে ফেলল।

॥ চোদ্দ ॥

'পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধ হল,
দিবস গণিতে নখ গেল।'

হয়েরে! শ্রীরাধার বিরহের তবু অন্ত ছিল। মনে তার আশা ছিল, বৃন্দাবনচন্দ্র একদিন আবার উদয় হবে তার হৃদয়-আকাশে। যমুনা আবার উজান বইবে। কদম্ব-কেশর আবার রোমাঞ্চিত হবে। মিলনের মধুস্পর্শে নিঃশেষে মুছে যাবে প্রিয় বিরহের সব গ্লানি।

কিন্তু অশ্রুর অন্তরের এই বিরহ-বেদনা যে অন্তহীন। নয়নের জলে যাকে সে বিদায় করেছে আর তাকে কাছে ডাকবে কিসের ছলে?

প্রত্যাখ্যানের বেদনা নিয়ে সেই যে তিমির চলে গেছে আর আসে নি।

কেমন করেই বা আসবে? কোন্ আশা নিয়ে?

কিন্তু নির্জন ঘরে একা একা অশ্রুর দিন যে আর কাটে না।

স্বপ্নে-জাগরণে একটি ব্যথাই সূচীমুখ অস্ত্রের মত অবিরাম আঘাতে হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে, অনেক অনেক প্রতীক্ষার পরে যদি বা সে এসেছিল উন্মুখ আগ্রহে হাত বাড়িয়ে, নির্মম অভিমানে সে নিজেই তো তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এখন এ স্বখাত সলিল থেকে তার যে উদ্ধারের আর কোন আশাই নেই।

তাহলে কি নিয়ে কিসের আশায় আর সে বেঁচে থাকবে?

অশ্রু একা বসে ভাবছিল। ভাবছিল অতীত জীবনের অনেক কথা। কবে এক অশুভ সন্ধ্যায় কান্নাভরা বুকে ওর হাত রেখেছিল আর একখানি জীর্ণ হাতে, সেই এক অতি-হিসাবী প্রবীণের সঙ্গে

অল্পদিনের পরিচয়, তার বিনীত নম্র ব্যবহার, তার শেষ শয্যা···সমীর চলে আসার পর মামাবাড়ির নির্যাতন, অসহ জীবন, ভায়ের উন্নতির আনন্দ, তিমিরের অকস্মাৎ আবির্ভাব, তার সহজ সরল আকর্ষণ, দৃঢ় অথচ সবিনয় ব্যবহার, নিজেকে সরিয়ে নিয়ে তার একান্ত নির্জন অবস্থিতি, তার মহত্ত্ব—এমনি অনেক চিন্তার ভাঙা ঢেউ, নির্জন মনের সাগরে যাদের নিয়ত অসংযত বিচরণ।

ভাবতে ভাবতেই কখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বাড়ির ছায়াটা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সামনের মাঠের বুকে। কখন সে ছায়াকে ঢেকে দিয় পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমল আকাশে। অকাল সন্ধ্যায় আবছায়া নামল প্রাঙ্গনে। সে সব কিছুই খেয়াল করে নি অশ্রু। খেয়াল করবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না।

এক সময়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল অশ্রু। আট-পৌরে যে কাপড় ছিল পরনে তার উপরেই সাদা একটা উড়নি জড়িয়ে গেট খুলে পথে বেরিয়ে পড়ল। সব সময়ের ঝি কালীর মাকে বলে গেল, সে একটু বেড়াতে বের হচ্ছে।

সদর বন্ধ করতে এসে কালীর মা একবার আকাশে মুখ তুলে থমকে দাঁড়াল। কি যেন বলতে গেল। কিন্তু গেট পেরিয়ে অশ্রু তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। তাই মুখের কথা আর বের হলো না তার। মুখে-চোখে একটা হতাশার ইঙ্গিত ফুটিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

চিন্তার হাত এড়াবার জন্যে অশ্রু বেড়াতে বার হয়েছিল। কিন্তু পথ ওকে চিন্তাতুর করল আরও। ভাবনার পথচলায় সময়ের পাখা দ্রুততর হল। তাই কখন যে অবেলার সূর্য আঁধারে পথ হারাল, কখন যে মেঘ করল আকাশে—এ সব অশ্রু খেয়ালই করে নি। মেঘ গর্জনে চমকে ও দেখল বৃষ্টি আসন্ন। জোরে পা চালিয়ে দিল বাড়ির পথে।

অর্ধেক পথেই নামল ঘনবর্ষা। এক রকম নেয়ে উঠে অশ্রু যখন

ঘরে ফিরল, ওর শরীর তখন অবসন্ন, চোখে জ্বালা, মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। কোন রকমে কাপড় ছেড়ে বিছানায় দিল শরীর এলিয়ে।

জ্বর এল রাতে। তাপ উঠল অনেক। দুঃস্বপ্নের মত রাত কাটল।

রোগ ক্রমে চলল বেড়ে। বুকে ব্যথা। শরীর অত্যন্ত দুর্বল। সমীর অনেক দূরে। তাকে সংবাদ দেওয়া তাই সম্ভব নয়। তিমিরকে সংবাদ দেওয়ার কথাও অশ্রুর মনে হল একবার। কিন্তু পরমুহূর্তেই অভিমানী মন ওর মাথা নেড়ে উঠল: স্বেচ্ছায় যাকে সে সরিয়ে দিয়েছে দূরে, এ দুঃখের মাঝে আজ তাকে ডেকে আনা অসম্ভব।

পাশে বসে পাখার হাওয়া করছিল কালীর মা। অশ্রুর অভিমানক্ষুব্ধ অন্তরের যাতনার ছবি বুঝি ফুটে উঠেছিল ওর মুখের রেখায়। তার কপালে সস্নেহে হাতখানি বুলিয়ে দিতে দিতে কালীর মা বলল, তিমিরদাদাবাবুকে কি একবার খবর দেব দিদিমনি?

চমকে চোখ মেলে চাইল অশ্রু। বলল, আমার জন্যে তোমার খুব খাটুনি পড়েছে, না কালীর মা?

কালীর মা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না না, এ আপনি কি বলছেন? আমার আবার কিসের খাটুনি? কিন্তু আপনার এমন অসুখ—

বাধা দিল অশ্রু, তুমি বৃথাই এতটা চিন্তিত হচ্ছ কালীর মা। বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। এ দুদিনেই ছেড়ে যাবে।

জ্বর কিন্তু দুদিন কেন সাত দিন পরেও ছাড়ল না। অশ্রুও ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। বেশীর ভাগ সময়ই চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকে। নেহাৎ দরকারী দু'একটা কথা বলে। নইলে চুপ করেই থাকে।

সেদিনও তেমনি চুপচাপ শুয়ে ছিল অশ্রু। পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল কালীর মা। এমন সময় বাইরের খোলা দরজার কড়াটা কে যেন খুব মৃদুভাবে নাড়া দিল।

চোখ খুলে কান পতল অশ্রু। কোন কথা বলল না।

আবার কড়া নাড়ার শব্দ। ভীরু হাতের মৃদু শব্দ।

অশ্রুর বুকের ভিতরটা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল? বলল, দেখে এস তো কালীর মা, কে কড়া নাড়ছে।

ভীরু গলার শব্দ শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে, ভিতরে আসতে পারি একটু?

এ যে অপরিচিত কণ্ঠস্বর। এ তো তিমির নয়।

আশাভঙ্গের কালো ছায়া নেমে এল অশ্রুর মুখে। পরমুহূর্তেই একটা নতুন সম্ভাবনার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল তার মনে। এ কি তবে তিমিরের কোন লোক? তিমির পাঠিয়েছে তার খবর নিতে?

সাগ্রহে অশ্রু বলল, আসুন।

শংকিত পায়ে ঘরে ঢুকল একটি তরুণ। মাথায় ব্যাকব্রাশ করা ঝাকরা চুল। পরিধানে পায়জামা ও হাওয়াই শার্ট।

আগন্তুককে দেখেই রাগে ও ঘৃণায় অশ্রুর মুখখানা সহসা ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠল।

এক নজর দেখেই অশ্রুর বুঝতে এতটুকু বাকি রইলনা যে পাড়ার যে সব অপরিণতবুদ্ধি বালখিল্যের দল কিছুদিন হতেই অকারণে শিস্ দিয়ে, টিট্কিরি দিয়ে, ঘরের ছাতে-দেয়ালে নির্দোষ ঢিল ছুড়ে তাকে নানা ভাবে বিরক্ত করেছে, আগন্তুক তরুণটি সেই দলেরই একজন।

অশ্রু কঠিন গলায় প্রশ্ন করল, কি চাই তোমার?

ছেলেটি বিনীতভাবে বলল, আজ্ঞে না, কিছু চাই না।

তাহলে?

এই—আপনার একটু খোঁজ-খবর নিতে এলাম।

কারণ?

কালীর মাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম আপনার খুব অসুখ। অথচ বাড়িতে আপনি একা। যে ভদ্রলোক আপনার দেখাশুনা করতে আসতেন, তাকেও অনেকদিন দেখতে পাই না—

বাধা দিয়ে রুষ্ট গলায় অশ্রু বলল, তাঁর কথা থাক। আমার

জন্যে তোমার হঠাৎ এত দরদ উথলে উঠল কেন? বাড়িতে ঢিল মারবার মত সুযোগ বুঝি অনেক দিন পাও নি?

ছেলেটি মুখ কাচু-মাচু করে বলল, দেখুন, আমাদের দলের সে সব কাজের জন্য আমি সত্যি দুঃখিত। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, ওদের দলের একজন হলেও ঐ ধরনের নোঙরামিতে আমার কোন দিনই সায় ছিল না।

গম্ভীর গলায় অশ্রু বলল, শুনে সুখী হলাম। এবার তুমি আসতে পার।

ছেলেটি যেন ক্ষুণ্ণ হল কিছুটা। বলল, জানি আমাকে তাড়িয়ে দেওয়াই আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। আমি চলেই যাচ্ছি। তবু যদি আমাকে কখনও দরকার হয়, কালীর মাকে দিয়ে ডেকে পাঠাবেন। আচ্ছা, চলি।

যেমন সসংকোচে ঘরে ঢুকেছিল তেমনি ধীর পদক্ষেপেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ছেলেটি।

আশ্চর্য মানুষের মন। এতক্ষণে যেন সহসা ছেলেটির জন্য করুণায় ও সমবেদনায় অশ্রুর মনটা ভরে উঠল। মনে মনে বলল, আহা! এমন ভাবে ছেলেটাকে তাড়িয়ে না দিলেই হত। ও হয় তো ভাল মনেই এসেছিল একটু উপকারে লাগাবার আশায়।

অশ্রু কালীর মার দিকে চেয়ে বলল, ছেলেটি কোথায় থাকে কালীর মা?

আমাদের পাড়ায়ই থাকে দিদিমনি। বড় গরীব ওরা। মাসির কাছে থেকে কলেজে পড়ে।

কি নাম?

অরুণ।

একটু চুপ করে থেকে অশ্রু বলল, অরুণ ছেলেটি বোধ হয় তেমন খারাপ নয়, কি বল কালীর মা?

না গো দিদিমনি, অরুণ খুব ভাল ছেলে। পাড়ায় সবাই ওর সুখ্যাতি করে।

দেখ কালীর মা, তোমার সঙ্গে যদি দেখা হয় তাহলে ওকে একবার আমার কাছে আসতে বলো।

আচ্ছা।

বলবার অপেক্ষায় কিন্তু রইল না অরুণ। পরদিন বিকেলের দিকেই আবার এসে হাজির হল।

অনেক ক্ষণ থেকেই হয় তো হাজির হয়েছিল। অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল গেটের বাইরে। কি একটা কাজে কালীর মা খোলা বারান্দায় যেয়ে দাঁড়াতেই চাপা গলায় তাকে ডাক দিল, কালীর মা, শোন।

কালীর মা এগিয়ে গেল।

আজ কেমন আছেন তোমার দিদিমনি?

সেই এক রকমই। তা তুমি বাবু ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এস।

না। উনি আবার রাগ করবেন।

না না, রাগ করবেন না। দিদিমনি আমাকে বলেছিলেন তোমাকে ডেকে আনতে।

কথা কয়টি শোনামাত্রই একটা হঠাৎ-খুশির আভা যেন ছড়িয়ে পড়ল অরুণের সারা মুখে। বলল, তুমি ঠিক বলছ?

হ্যাঁ। এস।

কালীর মার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকল অরুণ।

অশ্রু দরজার দিকে পিছন ফিরে শুয়েছিল। বুঝি বা তন্দ্রাচ্ছন্নই ছিল।

কালীর মা ডাকল, দিদিমনি, দেখ কে এসেছে?

পাশ ফিরে অরুণকে দেখেই অশ্রুর মুখেও এক টুকরো হাসি খেলে

গেল। হাত বাড়িয়ে সামনের আসনটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, বস অরুণ, বোস।

বসতে বসতেই অরুণ বলল, আপনি আমার নামও জানেন দেখছি।

অসুখের সময় তুমি আমার খোঁজ খবর নিতে আসতে পার, আর আমি তোমার নামটাও জানতে পারব না ?

অশ্রুর কথা বলার হাল্কা ধরনে ফিক করে হেসে ফেলল অরুণ।

অশ্রুও হাসল। বলল, আচ্ছা অরুণ, হঠাৎ আমার খোঁজখবর নেবার কথা তোমার মনে হল কেন বলতো ?

লাজুক হাসি হেসে অরুণ বলল, সত্যি কথা বলব ?

নিশ্চয়।

আপনার মত আমার একটি দিদি ছিল।

দিদি !

হ্যাঁ। ঠিক আপনার মত। প্রথম দিন আপনাকে দেখে আমি তো চমকে উঠেছিলাম।

কেন ?

আমি ভাবতেই পারিনি যে সংসারে দুটি মানুষ কখনও এতটা এক রকম দেখতে হতে পারে। একেবারে ঠিক যেন আমার দিদি।

আর আমি যদি বলি যে ঠিক যেন নয়, আমি ঠিক তোমার দিদি।

দিদি ! উচ্ছসিত কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অরুণ।

হ্যাঁ দিদি। আজ থেকে তুমি আমার ছোট ভাই। আমার ভাইটি।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে একটুক্ষণ অশ্রুর দিকে চেয়ে রইল অরুণ। তারপর আসন থেকে উঠে অশ্রুর পায়ের উপর মাথা রেখে প্রণাম করল।

কথা প্রসঙ্গে ক্রমে অরুণের দিদির সব কথাই জানল অশ্রু।

জানল আর মিলিয়ে নিল নিজের জীবনের সঙ্গে। দুটি মানুষের চেহারার মিল দেখেই বিস্মিত হয়েছিল অরুণ কিন্তু দুটি জীবন ধারার মধ্যে তার চেয়েও বিস্ময়কর মিল যে থাকতে পারে সে কথা কি বেচারি অরুণ জানত।

যেন পাশাপাশি প্রবহমান দুটি সমান্তরাল নদী। একই উৎস, একই গতিভঙ্গী। শুধু উপসংহারে এসে দুই বিপরীৎ খাতে বয়ে গেল দুটি ধারা। একটি হারিয়ে গেল জীবনের দগ্ধ মরুভূমিতে। আর একটি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর ধারায় বয়ে চলতে লাগল অশ্রুজলের বিশীর্ণ রেখার মত।

অরুণের দিদি।

সে বেচারিও প্রথম প্রেমের দুর্বার আবেগ দিয়ে ভালবেসেছিল একটি ছেলেকে। ছেলেটির চোখেও ফুটেছিল রামধনু-রঙ। তবু একদিন ঝড় উঠল। বর্ণ-কৌলিণ্যের কালো ঝড়ে ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গের মত দুজনে ছিটকে পড়ল দুদিকে। কিন্তু প্রথম মিলনের ব্যর্থতার সে তীব্র আঘাত সহ্য করতে পারল না অভাগিনী মেয়েটি। আত্মহত্যার পথেই সে মুছে ফেলল ব্যর্থ জীবনের সব গ্লানি।

একাগ্র মনে অরুণের মুখ থেকে সে অশ্রুসজল কাহিনী শুনল অশ্রু। শুনল আর নিজের ব্যর্থ জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে লাগল।

মিলিয়ে নিতে নিতেই হঠাৎ এক সময়ে আতংকে শিউরে উঠল অশ্রু। একটা ভয়ানক সম্ভাবনার শিখা মনের কোণে দপ্ করে জ্বলে উঠেই দেখতে দেখতে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল তার সারা মনে।

ছেলেটির প্রত্যাখ্যান সইতে না পেরে মেয়েটি যে চরম পথ অবলম্বন করেছিল সেদিন, আজ যদি অশ্রুর প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে না পেরে তিমির সেই চরম পথকে অবলম্বন করে তার জীবনে?

সেই যে সেদিন মাথা নিচু করে সে চলে গেছে এ-বাড়ি থেকে তারপর থেকে তার আর কোন খবর নেই। অশ্রুও তার খবর নেয় নি। সেও আর আসে নি।

কেন আসে নি?

যদি কোন অঘটন ঘটে থাকে?

যত ভাবে ততই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে অশ্রুর মনে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে।

তুচ্ছ মনে হয় যত মান-অভিমান। মিথ্যা মনে হয় লজ্জা-অপমানের ভয়।

সহস্র কণ্ঠে চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয়, অশ্রুর সব অভিমান তুমি ভেঙে দাও। তার সব লজ্জা-অপমান তুমি হরণ কর।

তীব্র ঘূর্ণির কবলে পড়ে যেন শেষ অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরছে এমনি আর্ত গলায় অশ্রু ডাকল, কালীর মা।

কালীর মা দ্রুত পায়ে ছুটে এল সে ডাক শুনে।

কি হল দিদিমনি?

তুমি এখনই একবার অরুণকে ডেকে আন তো কালীর মা। বলবে খুব জরুরী দরকার। এখনই যাও।

কালীর মা চলে গেল।

অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে লাগল অশ্রু। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে তার দুর্বল বুকটা তখনও থর্ থর্ করে কাঁপছে।

জীবনের পথ বড় বিচিত্র।

চলতে চলতে কখন কোথায় কি ভাবে যে তার মোড় ঘুরবে সে কথা কেউ বলতে পারে না।

নইলে অরুণের কাছ থেকে কালীর মার ফিরে আসবার পূর্ব-মুহূর্তেও অশ্রু কি ভাবতে পেরেছিল যে জীবনের যে-পথ থেকে সে সজোরে নিজেকে এতদিন সরিয়ে রেখেছিল একটা আকস্মিক ঘটনা-চক্রের ফলে সেই পথেই তাকে পদক্ষেপ করতে হবে।

হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসে কালীর মা বলল, সর্বনাশ হয়েছে দিদিমনি।

আঁতকে উঠল অশ্রু। রোগজীর্ণ দেহটাকে একটু ঠেলে তুলে বলল, কি হয়েছে?

পাড়ার ছেলেরা মিলে অরুণদাদাবাবুকে খুব মেরেছে।

সে কি? কেন?

জবাব দিতে একটু ইতস্তত করছিল কালীর মা। অশ্রু বলল, চুপ করে আছ কেন? শিগগির বল।

কী আর বলব দিদিমনি। পাড়ার ছেলেরা নাকি অরুণদাদা-বাবুর সামনে তোমার নামে কী সব যা তা বলেছিল। অরুণদাদবাবু তাতে বাধা দেয়। এই নিয়ে কথাকাটাকাটি হতে নাকি অরুণদাদাবাবু একজনকে ধা করে একটা ঘুসি মেরে বসে। তাই থেকেই একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড। সবাই মিলে ছেলেটাকে না কি কী মারই মেরেছে।

বল কি কালীর মা? আমার জন্য শেষ পর্যন্ত অরুণকেও মার খেতে হল?

দুই হাতে চোখ ঢাকল অশ্রু। কালীর মা বলতে লাগল, অরুণ-দাদাবাবুর কপালই মন্দ দিদিমনি। বাপ-মা নেই। থাকে মাসির কাছে। মাসি তো এমনিতেই দেখতে পারে না। এই ব্যাপারের পরে সেও যেন ক্ষেপে গেছে। সে নাকি বলেছে, ও গুণ্ডা-বদমায়েস ছেলেকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।

সভয়ে অশ্রু বলল, বল কি কালীর মা? অরুণ তাহলে এখন আছে কোথায়?

কয়েকটি ছেলে নাকি ধরাধরি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। মাথা নাকি কেটে গেছে বেশ খানিকটা।

ইস্! কী হবে তাহলে কালীর মা?

কী আর হবে। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেও ওই মাসিরই লাথিঝাঁটা খাবে।

না না, সে কিছুতেই হবে না। আমিই ওর এ কষ্টের কারণ। আমিই এর বিহিত করব। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে ও এই বাড়িতেই থাকবে।

ভয়ে ভয়ে কালীর মা বলল, সেটা কি ঠিক হবে দিদিমনি। তাতে যে লোকের মুখ আরও বেরে যাবে—

কালীর মা! বিকারগ্রস্ত রোগীর মত হঠাৎ চীৎকার করে উঠল অশ্রু। কালীর মা কথা বলতে বলতে মাঝ পথেই থেমে গিয়ে ভয়ার্ত চোখে তাকাল তার দিকে।

যেন গভীর যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অশ্রু বলল, লোকের খালি মুখই আছে, চোখ তো নেই। আমার দুঃখ তো তারা দেখতে পায় না। আমি যে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেলাম—

দুঃসহ উত্তেজনায় কাঁপা গলায় কথাগুলো বলতে বলতেই হঠাৎ কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে বিছানায় ঢলে পড়ল অশ্রু। পড়েই জ্ঞান হারাল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত চেঁচিয়ে উঠল কালীর মা, দিদিমনি—দিদিমনি—

যখন জ্ঞান ফিরল অশ্রুর তখন রাত হয়েছে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল অশ্রু। বুঝি মনটা তার একটা অভূতপূর্ব আনন্দে নেচে উঠল। উৎকণ্ঠ দুই চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে দেখে এক পাশে বসে আছে তিমির।

সস্নেহে তিমির বলল, কেমন লাগছে এখন? মাথায় কোন যন্ত্রণা আছে নাকি?

ঘাড় নাড়ল অশ্রু। বলল, তুমি!

হেসে তিমির বলল, না এসে কি আর উপায় ছিল? যা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছ।

এতক্ষণে যেন সমস্ত ঘটনাটা মনে পড়ল অশ্রুর। সসব্যস্তে সে প্রশ্ন করল, অরুণ কোথায়? সে কেমন আছে?

ডান হাতটা নেড়ে তিমির বলল, ভয় নেই, সে ভালই আছে। দিদির স্নেহ যে রক্ষা-কবচ। ভাইয়ের কি কখনও অমঙ্গল হতে পারে?

ম্লান হেসে অশ্রু বলল, থাক। কিন্তু অরুণ কোথায়? সে কি তার মাসির কাছেই—

বাধা দিল তিমির, না, সে এখানেই আছে। ও ঘরে ঘুমুচ্ছে। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন।

ও ঘরে?

হ্যাঁ। কালীর মার কাছে সব কথা শুনে আমিই এ ব্যবস্থা করেছি। অন্যায় কিছু করেছি কি?

ম্লান হেসে অশ্রু বলল, অন্যায় করবে তুমি? হায় আমার পোড়া কপাল! তুমি তো ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। কিন্তু সে কথা থাক। তুমি এ খবর পেলে কেমন করে?

খবর আমাকে দিয়েছে কালীর মা। এমন ভাবে যেয়ে কেঁদে পড়ল। ও বেচারি সত্যি তোমাকে ভালবাসে অশ্রু।

এ পৃথিবীতে সবাই তো আমাকে ভালবাসে। কেবল আমিই কাউকে ভালবাসলাম না কোনদিন।

অশ্রুর গলায় যেন অশ্রুর আভাষ ফুটে উঠল। সেটা উপলব্ধি করে তিমির বলল, এটা তোমার অভিমানের কথা অশ্রু।

কান্নার মত একটু হাসি হেসে অশ্রু বলল, অভিমান! আমি আবার একটা মানুষ! আমার আবার অভিমান!

অশ্রু!

অভিমান করবার জোরই যদি আমার থাকত তাহলে এমন ভাবে একলা আমাকে ফেলে তুমিও চলে যেতে পারতে না তিমিরদা।

কিন্তু কাছে আসবার সব পথ কি তুমিই সেদিন বন্ধ করে দাও নি অশ্রু? তুমিই কি বলনি—

বলেছি তিমিরদা, তোমাকে এখানে আসতে আমি নিষেধ করেছি। কিন্তু কেন যে করেছি, কত দুঃখে যে করেছি সে কি তুমিও বুঝবে না?

বুঝি অশ্রু, বুঝি। শুধু এইটুকু বুঝি না যে বিংশশতাব্দীর কলেজে-পড়া মেয়ে হয়েও কেন তুমি একটা মিথ্যা সংস্কারের বেড়াকে আজও আঁকড়ে ধরে আছ? কেন এক ধাক্কায় তাকে ভেঙে ফেলছ না?

তাকে ভেঙে ফেললেই কি তোমাকে কাছে পাব তিমিরদা?

আজও কি তোমার সন্দেহ যায় নি অশ্রু? আমি যে তোমার জন্যই অপেক্ষা করে আছি। বল তুমি সত্যি কাছে আসবে?

তিমির!

অশ্রু!

অশ্রুর দুই চোখে জল।

চোখের জলকে ঘিরে নামল রাতের আঁধার।

সে আঁধারে তারা হয়ে ফুটে উঠল দুটি মন।

একটি নয়, দুটি নয়, হাজার তারা ফুটল আকাশে।

একটি নয়, দুটি নয়, হাজার ফুল ফুটল কাননে।

অরুণ সেই থেকে অশ্রুর ছোট ভাইটি হয়ে তার কাছেই থাকে। ছেঁড়া হাফশার্ট গা থেকে খুলে নতুন জামা-জুতো পরে কলেজে যায়।

পাড়ার ছেলেরা আড়চোখে তাকায় আর বলে, একেই বলে কপালরে ভাই। মার খেয়ে একেবারে লাটসাহেব বনে গেল।

অশ্রুই ডেকে পাঠিয়েছিল অরুণের মাসিমাকে। বলেছিল, অরুণের ভার আমিই নিলাম মাসিমা। একা একা থাকি। তবু আমার একটি সাথী জুটবে।

মাসিমা খুশিতে বিগলিত হয়েই সে প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন।

আর অশ্রু আর তিমির।

অনেক খুশির তারায় তারায় এখন ঝিলমিল ওদের মনের আকাশ।

জীবনের অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে দুজন আবার এসে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি। এখন হাতে হাত ধরার যা বাকি।

একদিন বিকালে বাইরের খোলা বারান্দায় বসে সেই কথাই হচ্ছিল দুজনে।

অশ্রু হেসে বলল, কিন্তু তোমার ওই এক ঘরের বাসা তুমি কবে ভাঙছ বল।

তিমির হেসে বলল, যতদিন ভাল বাসা না পাই।

ভাল বাসা কি এতই দুর্লভ কলকাতা শহরে?

তা বই কি। ভাল বাসা যে ভালবাসার মতই দুর্লভ। তবে মাভৈ, ভালবাসা যখন পাওয়া গেছে তখন ভাল বাসাও জুটবে।

কিন্তু কবে? আমি যে আর অপেক্ষা করতে পারছি না তিমির। সমীর ফিরে আসবার আগেই এ-পাট আমি চুকিয়ে ফেলতে চাই।

এবার যেন সহসা গম্ভীর হল তিমিরের গলা। বলল, কিন্তু অপেক্ষা যে আমাদের করতেই হবে অশ্রু।

তিমিরের গলা শুনে চমকে তার মুখের দিকে তাকাল অশ্রু। সবিস্ময়ে বলল, এখনও অপেক্ষা করতে হবে? কি বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি। অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

কিন্তু কেন? কেন গতি নেই?

কি যেন বলতে যাচ্ছিল তিমির। তাকে বাধা দিয়ে অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল অশ্রু, জানি, জানি কি তুমি বলতে চাও। সেই মামুলি কথা তো? এত অল্প উপার্জনে কি করে সংসার চালাবে? গৃহলক্ষ্মীকে কেমন করে বসাবে লক্ষ্মীছাড়ার ভাঙা কুড়েয়? এই তো?

হ্যাঁ তাই। তবে তাই সব নয়। আরও আছে।

আরও আছে? কি আছে?

অধৈর্য হয়ো না অশ্রু। শান্ত হও। শান্ত মনে শোন আমার সব কথা। সব কথা বলব বলেই আজ এসেছি।

তিমিরের কথার ধরনে কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল অশ্রুর। কী সে বলতে চায়? কোন্ গূঢ় গোপন কথা?

সে কথার আঘাতে ভেঙে যাবে না তো তার অনেক আশার স্বপ্নের ঘর?

ধীর সংযত গলায় সব কথা বলল তিমির।

এম, এ, ক্লাসে পড়তে পড়তেই আই, সি, এস, পরীক্ষা দেবার জন্য বিলেত যাবার কথা উঠল তিমিরের। সব ব্যবস্থাও পাকা হল।

কিন্তু সেই পাকা ব্যবস্থাকে আরও পাকা করতে যেয়েই সব ব্যবস্থা কাঁচা হয়ে গেল।

অধীরপ্রসন্ন ভাবলেন, ছেলে বিলেত থেকে আই, সি, এস, হয়ে

আসবে ঠিকই। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি একটি নীল নয়নাকে তাঁর পুত্রবধূ করে নিয়ে আসে, তাহলে ?

অচিরেই সে সম্ভাবনার পথ রোধ করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন তিনি। তিমিরের বিয়ের ব্যবস্থাও এক জায়গায় প্রায় পাকা করে ফেললেন।

বিয়ের উদ্যোগ-পর্বেই মায়ের কাছে আপত্তি জানাল তিমির। স্পষ্টভাবেই জানাল, বিয়ে এখন সে করতে পারবে না।

কিন্তু অধীরপ্রসন্ন সে আপত্তি কানে তুললেন না। কাঁচা সোনার মত মেয়ে আর পাকা সোনার প্রচুর অলংকারের ঝলঝলানিতেই বাজী মাত করতে পারবেন, এ বিশ্বাস তাঁর মনে দৃঢ় ছিল।

পৃথিবীতে সব মানুষের রুচি ও বুদ্ধির গতি এক নয়।

নিজের ছেলেকেও এতদিন কাছে কাছে থেকেও তিনি চিনতে পারেন নি। হয় তো চিনতে চানও নি কোনদিন।

বিয়ের ব্যবস্থা যখন প্রায় পাকা, তখন একদিন সব ব্যবস্থা ভেস্তে দিল তিমির।

স্পষ্ট গলায় সে অধীরপ্রসন্নকে বলল, আপনার আর সব আদেশ সব ব্যবস্থা আমি মাথা পেতে নিয়েছি। কিন্তু এবার আমি অক্ষম। আমাকে ক্ষমা করবেন।

রেগে আগুন হলেন অধীরপ্রসন্ন। বললেন, সোজা কথায় বল তুমি এ বিয়েতে রাজী নও ?

হ্যাঁ; বিয়ে এখন আমি করতে পারব না।

যদি সেই স্কুল-মাস্টারের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করি ?

মাথা তুলে ভৎ‍সনার সুরে তিমির বলল, কোন মানুষকেই বার বার অপমান করবার অধিকার আপনার নেই।

একটু চুপ করে রইলেন অধীরপ্রসন্ন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, কিন্তু আমার আদেশ অমান্য করার ফল কি হতে পারে ভেবে দেখছ ?

দরকার বোধ করি নি।

তিমির! রাগে ফেটে পড়লেন অধীরপ্রসন্ন। কি বলতে যেয়েও থেমে গেলেন। একটু পরে বললেন, তুমি কি ভেবেছ আর এক দফা স্ফুর্তি করে বেড়াবার জন্য তোমাকে আমি বিলেত পাঠাব?

তিমির কঠিন গলায় বলল, আপনার কথা যদি শেষ হয়ে থাকে তাহলে—

না, কথা আমার শেষ হয় নি। শোন। বিয়ে যদি না কর তাহলে তোমাকে আমি বিলেত পাঠাব না।

বিলেত যেতে আমি চাই না।

আমার বিষয়-সম্পত্তি, আমার আশ্রয়, আমার স্নেহ-ভালবাসা—সব থেকে তুমি বঞ্চিত হবে।

বিষয়-সম্পত্তিতে আমার লোভ নেই। আর স্নেহ-ভালবাসা—

বলতে বলতেই হঠাৎ থেমে গেল তিমির। কথা বললেন অধীর-প্রসন্ন, কি বলছ তুমি? বাপ-মার স্নেহ-ভালবাসার চেয়ে একটা ছলনাময়ী মেয়ে তোমার কাছে বড় হল?

আপনি যদি অশ্রুর কথা বলে থাকেন তাহলে বলব সে ছলনাময়ী নয়, কল্যাণময়ী।

তিমির, তোমাদের আধুনিক লেখাপড়ায় বুঝি সহজ ভদ্রতাবোধ বলেও কিছু নেই? বাবার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বেলেল্লাপনার ইতিহাস ঘাটতে তোমার লজ্জা করল না। বেশ, তাহলে সেই কল্যাণময়ীর আঁচলের তলায়ই আশ্রয় নাও গে। এ বাড়িতে থেকে আমার মুখে আর চুণ-কালি মাখিও না। দুষ্টু গরুর চেয়ে আমার শূণ্য গোয়ালই ভাল।

বাবা!

আমার কথার একটাই অর্থ। তুমি এখন ইচ্ছা করলে যেতে পার।

বেশ, আমি যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে শুধু একটা কথা বলে

যাই। যতদিন আপনি বেঁচে থাকবেন, এ বাড়িতেও আসব না, আর অশ্রুর সঙ্গেও কোন সম্পর্ক আমি রাখব না।

কি লাভ হবে তাতে?

হয় তো আপনার মুখে তাহলে চুণ-কালি লাগবে না। তাছাড়া, আর যাই হই আমি যে বেলেল্লা নই, তার একটুখানি পরিচয় অন্তত আপনি পাবেন।

কথা শেষ করেই হন্ হন্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তিমির। ছেলের কাছ থেকে এতটা বোধ হয় আশা করেন নি অধীরপ্রসন্ন। ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় তিনি হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

কাহিনী শেষ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল তিমির। চেয়ে দেখল, অশ্রু অভিভূতের মত তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। দুটি অশ্রুর বিন্দু মুক্তা-ফলের মত টলমল করছে তার চোখে।

একটুখানি হেসে তিমির একটি কবিতা আবৃত্তি করে তার কাহিনীর উপসংহার টানল। বলল, বুঝতেই তো পারছ, সেই থেকেই—

'ঘরের মঙ্গল-শংখ নহে তোর তরে
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ় ফণা,
নিন্দা দেবে জয় শংখনাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।'

দুটি ছলছল চোখ তুলে অশ্রু বলল, বুঝেছি গো, বুঝেছি, আমারই জন্য এত কষ্ট তুমি সহ্য করেছ। মা-বাপ বিষয়-সম্ভোগ সব ছেড়ে এমন সন্ন্যাসীর মত জীবন কাটাচ্ছ।

তিমির বলল, শুধু তোমার জন্য বলছ কেন অশ্রু। আমি যা করেছি আমার জন্যেই করেছি। সাধনা না করলে কি ইষ্টলাভ হয়?

কিন্তু আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না, সব কথা না জেনেই দুর্জয় অভিমানে তোমাকে আমি কত ভুল বুঝেছি, কতদিন কত আঘাত তোমাকে দিয়েছি।

তুমিও কি জান না, আবেগের গভীরতা যত বেশী অভিমানের তাপমাত্রাও ততই উর্দ্ধগতি।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অশ্রু বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

কর।

তোমার বাবা-মার খবর রাখ?

মা অনেকদিন চলে গেছেন। বাবা এখনও বেঁচে আছেন দেশের বাড়িতে। এবার আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

অশ্রু চোখ তুলে তাকাল শুধু। কোন কথা বলল না। কথা বলল তিমির, অভিমানের বশে সেদিন যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বাবার কাছে, বুদ্ধির বিচারে সেটা হয় তো একান্তই মূল্যহীন, তবু আমার কাছে তার মূল্য যে অনেক অশ্রু।

তুমি কি বলতে চাও? আঁতকে উঠল অশ্রু।

অশ্রু, তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারবে না?

অশ্রু কেঁদে ফেলল। বলল, এ কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? তুমি কি জান না? পারব গো পারব। তোমার জন্য আমি সব পারব।

তারপর সব চুপ। আর কোন কথা নয়। শুধু দুজনে মুখোমুখি গভীর দুঃখে দুখী, আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

সমীর ফিরে আসছে।

জাহাজ থেকে নেমেই 'তার' করেছে—কোচিন থেকে ট্রেনে করে সোজা হাওড়া আসছে।

যথাসময়েই হাওড়া স্টেশনে হাজির হল তিমির ও অশ্রু।

ওদিক থেকেও বয়-আর্দালি সঙ্গে নিয়ে সপরিবারে এসেছেন মিঃ মজুমদার।

অশ্রু এগিয়ে যেয়ে মিঃ ও মিসেস্ মজুমদারকে প্রণাম করল।

মিঃ মজুমদার কটাক্ষে একবার তিমিরের দিকে তাকিয়ে অশ্রুকে লক্ষ্য করে বললেন, ওঃ তুমিও এসেছ দেখছি। তা তো আসবেই। আজ আমাদের কত বড় আনন্দের দিন। ভাল ভাবে ট্রেনিং কম্‌প্লিট করে সমীর ফিরে আসছে। কোম্পানীতে তার জন্যে স্যুটেব্‌ল পোস্ট রেডি হয়ে আছে।

অশ্রু সানন্দে বলল, তাই বুঝি?

ওঃ ইয়েস। অ্যাম্বিশন এ্যাণ্ড পারসি্ভেরান্স কাণ্ট গো আন্-রিওয়ার্ডেড।

সশব্দে ট্রেন এসে প্লাটফর্মে ঢুকল।

একটা প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ কামরার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে সমীর আর মলি। মলির হাতে উড়ছে ছোট একখানা রুমাল। তার বব-কাটা চুল উড়ছে বাতাসে।

অশ্রুর বুকের ভিতরটা আনন্দে তোলপাড় করে উঠল।

উঃ, কী সুন্দর দেখতে হয়েছে সমীর। শীতের দেশের আলো-জলে কেমন আশ্চর্য ভাবে বদলে গেছে তার চেহারা। কত ফর্সা হয়েছে। একটা লাল্‌চে আভা যেন ঝলমল্ করছে সারা মুখে।

সাগ্রহে প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে এগিয়ে গেল অশ্রু।

কামরা থেকে নামল সমীর। তার পিছনে মলি। মলির পিছনে আয়ার কোলে ছোট্ট একটি শিশু। যেন এক স্তবক ফোটা যুঁই।

সমীর ও মলি কামরা থেকে নেমেই প্রণাম করল মিঃ ও মিসেস্ মজুমদারকে। তারপর প্রণাম করল অশ্রুকে। তিমির একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। অশ্রু বলল, তোমার দাদাকে প্রণাম কর সমীর।

ওঃ ইয়েস। ইউ আর অল্‌সো হিয়ার!

সমীর এক পা এগোতেই তার সামনে এসে দাঁড়াল তিমির। সমীর প্রণাম করল। তিমির থাক থাক বলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

মলি কিন্তু এদিক পানে একবার ফিরেও তাকাল না। বাপ-মা ভাই-বোনকে নিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে রইল।

অশ্রু বলল, তোর খুকি বুঝি?

হ্যাঁ। কেন তোমাকে লিখি নি ওর কথা? নিশ্চয় লিখেছি। তুমি ভুলে গেছ। ওখানেই নার্সিং হোমে হয়েছে তো। দেখ না কি রকম চার্মিং হয়েছে দেখতে।

সমীর বক্ বক্ করে অনেক কথাই বলে চলল। অশ্রুর কানে কি সে সব কথা পৌঁছুল? বুকের ভিতরটা তার যন্ত্রণায় মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল। সমীরের মেয়ে হয়েছে, অথচ সে সংবাদটা পর্যন্ত দিদিকে জানানো সে দরকার বলে মনে করে নি।

অশ্রুর এ মানসিক বিপর্যয়ের কথা বুঝতে পারল তিমির। তাই প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য এগিয়ে এসে সে বলল, সত্যি সমীর, খুব লাভলি হয়েছে তোমার খুকি। নাম কি রেখেছ ওর?

আমি রাখি নি, নাম রেখেছে ও'ল। পামেলা। তবে আমরা ডাকি মেলি বলে।

হেসে তিমির বলল, মেলি বেশ নাম। কিন্তু কি মেলি? চোখ মেলি, না দল মেলি।

সমীর হো-হো করে হেসে উঠল, দেয়ার ইউ আর। ঝাস্ট লাইক এ পোয়েট।

আদালি এসে সেলাম করে দাঁড়াল মিঃ মজুমদারের সামনে।

মিঃ মজুমদার বললেন, মাল-পত্র সব তুলেছিস্ গাড়িতে?

হুজুর।

ব্যাস্। ঠিক আছে। সমীর, তাহলে আর দেরী নয়। বেলা অনেক হয়েছে। চটপট গাড়িতে উঠে পড়।

অশ্রুর দিকে চেয়ে সমীর বলল, আচ্ছা দিদি, এখন তাহলে চলি; বিকেলে যাচ্ছি আমরা বাসায়। তোমরা তৈরী থেক।

অশ্রুকে আর কোন কথা বলবার অবসরমাত্র না দিয়ে সমীর সকলের পিছনে যেয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ি বেরিয়ে গেল।

সেই ধোঁয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ এক সময় চোখে আঁচল চাপা দিল অশ্রু।

তিমির এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, অশ্রু, বাড়ি চলো।

চোখ মুছে অশ্রু বলল, ভোর রাতে উঠে আমি যে ওর জন্যে কত রকম খাবার তৈরী করেছি। চন্দ্রপুলি খেতে ও ভালবাসে, তাই—

কথাটা শেষ না করেই আবারও চোখে আঁচল দিল অশ্রু। তিমির বলল, মানুষের সাধ আর সাধ্যের মধ্যে যে অনেক তফাৎ অশ্রু। যা ঘটবেই তাকে শান্ত মনেই মেনে নিতে পারা চাই। নইলে শুধু অশান্তিই বাড়ে, লাভ কিছুই হয় না।

প্ল্যাটফর্মটা পার হয়ে আসতে আসতে অশ্রু বলল, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে সবই তো বুঝি তিমির, কিন্তু মন যে মানেনা। ওকে যে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি।

তিমির বলে উঠল হেসে, কোলে-পিঠে করে যাকে মানুষ করেছ মানুষ হয়ে ওঠার পর সে আর তোমার কোলে-পিঠে চড়ে থাকতে চাইবে না, এই তো নিয়ম। সেটা ভুললে চলবে কেন।

সন্ধ্যার পরেই মিঃ মজুমদারের মস্তবড় গাড়ি এসে দাঁড়াল সমীরদের শহরতলীর বাড়ির সামনে।

হর্ণ শুনেই বারান্দায় এসে দাঁড়াল অশ্রু আর কালীর মা।

গাড়ি থেকে নামল সমীর, মলি আর আয়ার কোলে পামেলা।

অশ্রু দ্রুতপায়ে নেমে এসে পামেলাকে কোলে নেবার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দিল।

বাধা দিল মলি, ও ঘুমিয়ে পড়েছে দিদি, ওকে কোন্ ঘরে শোয়াবে ঘরটা দেখিয়ে দাও। আয়াই শুইয়ে দেবে। নইলে ওর ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

আচমকা একটা ধাক্কা খেল অশ্রু। তবু সমীর এসেছে তার কাছে এই আনন্দেই সে-ধাক্কাকে সামলে নিয়ে আয়াকে নিয়ে সে পাশের ঘরে চলে গেল।

সমীর চাপা গলায় বলল, মেলিকে একটু কোলে নিলে এমন কিছু ক্ষতি হত না মলি।

মলি সরোষে বলে উঠল, আমার মেয়ের কিসে ক্ষতি হয় না হয় সেটা আমি বেশ বুঝি। প্লিজ, এ নিয়ে তুমি কোন রকম 'সারমন' দিতে এসো না।

মলির কথা বলবার ধরনে সমীর বিরক্ত হল। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলল না। সে জানে, তাতে ঝামেলাই বাড়বে, মলির সংশোধন হবে না।

পামেলার শোবার ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়ে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল অশ্রু। বলল, পাশের ওই বড় ঘরটাতেই তোদের থাকবার ব্যবস্থা করেছি সমীর। দেখে আয় সব ব্যবস্থা তোর পছন্দ মত হয়েছে কি না। তুমিও যাও মলি।

তিন জনেই পাশের ঘরে ঢুকল।

মধ্যবিত্ত সংসারের বেডরুম হিসেবে ঘরটা মোটামুটি ভালভাবেই সাজানো গোছানো হয়েছে। কিন্তু একে বড়লোকের মেয়ে তায়

বিলেত-ফেরৎ, মলির মন এ-ঘর দেখে প্রসন্ন হল না। ঘরে ঢুকেই তার ভুরু আর নাক সেই যে কোঁচকালো আর তা স্বাভাবিক হল না।

এক সময় মলি বলল, আমার জায়গা থাকবে কোন্ ঘরে? ওই পাশের অ্যাটাচ্‌ড্‌ ঘরটায় বুঝি?

অশ্রু জবাব দিল, না মলি, আয়ার জন্য ওদিককার একটা ঘর ঠিক করেছি।

মলির ভুরু আরও একটু কোঁচকালো, কেন? এই পাশের ঘরটা দিলেন না কেন?

একটু যেন সংকোচের সঙ্গেই অশ্রু জবাব দিল, ও ঘরটায়—মানে ও ঘরটায় অরুণ থাকে কিনা তাই—

তির্যক চোখ তুলে মলি সবিস্ময়ে বলল, অরুণ!

এই পাড়ারই একটি সহায়হীন ছেলে, এবার আর সংকোচের ছোঁয়া নেই অশ্রুর গলায়, আমার কাছেই থাকে, কলেজে পড়ে।

ওঃ!

মলির গলায় এমন একটা শানিত বিদ্রূপ ওই একটি মাত্র অক্ষরের উচ্চারণের ভিতর দিয়ে ঝিলিক দিয়ে উঠল যে অশ্রুর বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধ্বক করে উঠল। প্রাণপন শক্তিতে সে জ্বালাকে সে নিজের অন্তরের মধ্যেই সংবরণ করে নিল। কোন জবাব দিল না।

কিন্তু সংঘাত যেখান পায়ে পায়ে চলে সেখানে কতক্ষণ তাকে এড়িয়ে চলবে অশ্রু? সেও তো মানুষ।

সন্ধ্যার পরে খাবাব টেবিলে আর একবার সংঘর্ষ বাঁধল।

সমীর আর মলির জন্যই টেবিলে খাবার ব্যবস্থা করেছে অশ্রু। রাত্রের অন্যান্য খাবারের সঙ্গে সকাল বেলাকার তৈরী চন্দ্রপুলি ও অন্য নানা রকমের পিঠেপুলিও সে নিজের হাতে সাজিয়ে দিল সমীর, মলি আর অরুণের সামনে।

অরুণ চন্দ্রপুলি মুখে দিয়েই সোৎসাহে বলে উঠল, উঃ, এই চন্দ্র-পুলিগুলো যা বানিয়েছে না দিদি একেবারে ক্লাস ওয়ান।

অরুণের ডিসে আরও একটা চন্দ্রপুলি তুলে দিয়ে অশ্রু বলল, সমীর তো ও বেলা এখানে আসতে পারল না। তাই তোদেরও পিঠেগুলো খেতে দিতে পারলাম না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কি আর এ সব জিনিষের তেমন স্বাদ থাকে! গরম গরম খেতেই তো এর আসল মজা।

মলি ভুই চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করল, আপনি কি তাহলে সেই কোন্ সকালে এই সব খাবার তৈরী করে রেখে তবে স্টেশনে গিয়েছিলেন দিদি?

মলির প্রশ্নের আসল ইঙ্গিতটা অশ্রু তখনও বুঝতে পারে নি। সে তাই খুশি-খুশি মুখেই বলল, হ্যাঁ। সমীর এ সব খেতে খুব ভালবাসে কিনা ছোটবেলা থেকেই—

মুখের কথা তার মুখেই রয়ে গেল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মলি বলে উঠল, ওসব বাসি খাবার তুমি মুখে দিও না সমীর, ডিস সরিয়ে রাখ।

সমীর সবিস্ময়ে বলে উঠল। সে কি? কেন?

ব্যঙ্গভরে মলি জবাব দিল, আঁতকে উঠলে যে একেবারে? ভুলে যেও না যে দিদির হাতের তৈরী হলেও বিষ বিষই।

বিষ! আতংকে বুঝি চীৎকার করে উঠল অশ্রু।

মলি সহজ শক্ত গলায়ই বলল, হ্যাঁ বিষ। বাসি খাবার আর বিষের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা যেন স্পষ্ট হল সকলের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দারুণ ক্ষোভে অশ্রুর সমস্ত মন যেন জ্বলে উঠল। সেও পাল্টা জবাবে বলল, তুমি ভুলে যাচ্ছ মিলি যে আজ বিলেত ফেরৎ বড় মানুষ হলেও দিদির হাতে দেওয়া বাসি খাবার খেয়েই সমীর ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়েছে।

মলিও ছেড়ে কথা বলবার মেয়ে নয়। কঠিন গলায় সে বলল, এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না দিদি। তবে মানুষ হবার কথাই যদি বলেন তাহলে আমিও বলছি যে বয়সে বড় হওয়া

আর মানুষ হওয়া এক কথা নয়। ওকে যে কি ভাবে কত বড় মানুষ করে আপনারা তুলেছিলেন সে কথা জানতে আমার বাকি নেই।

নিজে আধপেটা খেয়ে কখনও বা না খেয়ে এই বাপ-মা মরা একমাত্র ভাইটিকে কত কষ্ট করে সে যে বড় করে তুলেছে সে-কথা শুধু অশ্রুই জানে। তাই সেই ভাইকে মানুষ করার ব্যাপারে ভ্রাতৃবধূর মুখের এই খোটায় তার দুই চোখ ফেটে জল এসে পড়ল।

সমীর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আঃ, কী বাজে কথা বলছ মলি। চুপ কর। ও-বেলার তৈরী পিঠে এ-বেলা খেলে কিছু ক্ষতি হয় না। মলির কথায় তুমি কিছু মনে করো না দিদি, ওদের বাড়িতে বাসি খাবার একদম চলে না কি না তাই—

ফোড়ন কাটল মলি, শুধু আমাদের বাড়িতেই নয়। বাসি খাবার কোন ভদ্রলোকের বাড়িতেই চলে না। চলা উচিত নয়।

আঃ, কী বলছ মলি! সসংকোচে আর একবার বাধা দিতে চেষ্টা করল সমীর।

কিন্তু অশ্রু ততক্ষণে নিজেকে সংবরণ করে নিয়েছে। ধীর হাতে পিঠেগুলিকে একটা বাটিতে তুলে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। অকম্পিত গলায় বলল, মলি ঠিকই বলেছে সমীর। আমারই ভুল হয়েছিল। সত্যি বাসি খাবার তোদের দেওয়া আমার উচিত হয় নি।

সমীর তবু কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু অশ্রু তখন পিঠের বাটি নিয়ে পাশের ঘরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে বলে সে আর কিছু বলতে পারল না। অশ্রু পাশের ঘরে চলে গেল। তার দুই চোখে তখন অশ্রুর ধারা।

ঘটনার জের কিন্তু সেখানেই মিটল না।

দিদির এত যত্ন করে তৈরী করা পিঠে সে মুখেও তুলতে পারে নি। তার উপর এই নিয়ে মলির মুখের কঠোর বাক্য-বাণের কোন সক্ষম প্রতিবাদ পর্যন্ত সে করতে পারে নি। এ নিয়ে সমীরের মনে ক্ষোভের একটা তীক্ষ্ণমুখ কাঁটা অবিরাম খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধতে লাগল।

রাতে বিছানায় বসে সে তাই এক সময় বলল, দেখ মলি, খাবার টেবিলে দিদিকে ও ভাবে কথা বলা তোমার অন্যায় হয়েছে।

সমীর যে এ প্রসঙ্গ আবার তুলতে সাহস করবে সেটা মলি ভাবতে পারে নি। কি বাপের বাড়িতে কি বিয়ের পরে বিলেত যাবার পরে, তার যখন যেমন খুশি তেমনি ভাবেই চলতে-ফিরতেই সে অভ্যস্ত। তার কোন আচার-আচরণের কেউ প্রতিবাদ করে তা সে সহ্য করতে পারে না। মলির এ স্বভাব সমীরের অজানা নয়। তাই এতাবৎকাল মলির সব স্বেচ্ছাচারিতাই সে নীরবে সহ্য করে এসেছে। মলিও সমীরের সেই নিরঙ্কুশ বশংবদতায়ই অভ্যস্ত। আজ হঠাৎ সমীরের গলায় তার ব্যতিক্রমের স্বর শুনে মলি তাই দপ করে জ্বলে উঠল। বলল, আমার কি অন্যায় আর কি ন্যায় সেটা আমি বেশ ভাল ভাবেই বুঝি।

সমীরের মনের ধূমায়িত ক্ষোভটাও যেন হঠাৎ ফেটে পড়ল। সে চাপা দৃপ্ত কণ্ঠে বলল, না, বোঝ না। তা যদি বুঝতে তাহলে দিদির বাড়ি থেকেও তাকে এমন ভাবে অপমান করতে পারতে না।

কী বললে? দিদির বাড়ি। মলিও রাগে জ্ঞান হারাল। বলতে তোমার একটু লজ্জা করল না? বলি, এ বাড়ির ভাড়াটা আসে কোত্থেকে? দিদি কি রোজগার করেন?

বস্তুবিশেষের স্পর্শমাত্রে উন্নতশীর্ষ ভুজঙ্গ যেমন নতশির হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি ভাবেই সহসা নিস্তেজ হয়ে পড়ল সমীর। তার সব শক্তি সব স্পর্ধার মাথায় যেন লগুড়াঘাত হল।

মলি কিন্তু সেখানেই থামল না। তার উদ্ধত বোধ এত অল্প আঘাতে তৃপ্তি পেল না। একটু চুপ করে থেকে সে তাই সমীরকে আঘাতের জন্য নতুন অস্ত্র নিক্ষেপ করল। বলল, আর বাড়ির কথাই যদি তুললে তাহলে বলি, এ বাড়িতে থাকা আমার চলবেও না।

সবিস্ময়ে মুখ তুলে শুধু তাকাল সমীর। কোন কথা বলল না।

কথা বলতে লাগল মলি, একে তো এই শহরতলীতে এতটুকু এক

পায়রার খোপে থাকা আমার পোষাবে না। তাছাড়া আরও একটা কথা আছে।

সমীরের চোখে মুখে আশংকা ও বিস্ময়ের ছায়া।

মলি একটানা বলে চলল, এ বাড়ির এই অভদ্র পরিবেশে আমার থাকা চলবে না।

—অভদ্র পরিবেশ! সমীর যেন আর্তনাদ করে উঠল। কি বলছ তুমি?

—চোখ থাকলে তুমিও দেখতে পেতে, আমাকে বলতে হত না। একে তো তোমার আপিসের সেই লোকটা—সেই যে যাকে তোমরা তিমিরদা না কি বল—সে তো দেখছি তোমার অনুপস্থিতিতেও তোমার দিদির সঙ্গেই লেগে আছে। আজ সকালে স্টেশনেও দেখলাম দুজনে জোড়ে হাজির ছিলেন।

মলি! তুমি থাম।

না থামব না। আমার আরও বলবার আছে। এ বাড়িতে এখন তো যত সব বাজে লোকের আড্ডা জমেছে।

বাজে লোক?

নয় তো কি? ওই যেন অরুণ না কে। কোন কূলে কেউ নেই। ঢং করে তাকে আবার বাড়িতে রাখা হয়েছে। বলি, এ সব কোন্ ভদ্র ব্যবস্থা শুনি? যার এতটুকু প্রেষ্টিজ বোধ আছে সে কখনও এসব ইতর ব্যবস্থা বরদাস্ত করতে পারে না। আমিও পারব না। তুমি কালই একটা ভাল ফ্লাট দেখ কোন ভদ্র পাড়ায়।

সমীরের মাথার মধ্যে এ কথার অনেক জবাবই কিলবিল করে উঠেছিল। কিন্তু কোন জবাবই সে দিল না। সে ভালভাবেই জানে প্রতিবাদের বাতাসে মলির জিহ্বার আগুন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাবে। তাই একান্ত নিরুপায় হয়েই সে নীরবে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। মলির বাড়ি-বদলের প্রস্তাবে হ্যাঁ—না কোন জবাবই দিল না।

॥ আঠারো ॥

অজা যুদ্ধের মত দাম্পত্য কলহেও বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়—এ প্রবাদ চিরন্তন। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। সে রাতে বাড়ি-বদলের প্রস্তাব মলি যতই দৃঢ়কণ্ঠ হোক না, তার সে রাতের কটু মন্তব্যের শরাঘাতে সমীর যতই আহত হোক না, পরদিন সকাল থেকেই যথারীতি ভদ্রজনের শান্তশিষ্ট রীতিতেই জীবন যাত্রা চলতে লাগল। সমীরের চা খাওয়া থেকে আপিসযাত্রা, আর ট্যাক্সিবিহারে মলির সারা কলকাতাময় সখীসম্ভাষণ এর কোনটাতেই এতটুকু শিথিলতা দেখা গেল না। অশ্রুও আদরের ভাইটির মুখ চেয়ে সে রাতের লাঞ্ছনাকে মনের তলে চেপে রেখে পামেলাকে কোলে তুলে নিয়ে বঞ্চিত জীবনের সান্ত্বনা খুঁজতে লাগল।

পৃথিবীর চাকা আহ্নিক গতির বাধা নিয়মে আবর্তিত হয়ে চলল।

তবু পরিবর্তন দেখা দিল।

বাইরে থেকে সে পরিবর্তন প্রথমটা চোখে ধরা পড়ল না কারও। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা প্রচণ্ড নাড়ায় সমীরের সমগ্র সত্তাটাই যেন দ্রুত বদলে যেতে লাগল।

জীবনে বড় হবার—অনেক অনেক বড় হবার, সাফল্যের সোপান হতে সোপানান্তরে আরোহনের এক উদ্দাম কামনার বেগে একদিন সে ঘর থেকে পথে নেমেছিল নিরুদ্দেশ যাত্রায়। সেই চলার বেগই তাকে সাজিয়েছিল কারখানার মজুর। মজুর থেকে মেকানিক। আজ সে জীবনে যশ পেয়েছে, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সাফল্যের পর সাফল্যের পালক তার জয়মুকুটের শোভা বর্ধন করেছে। কিন্তু কৈ, শান্তির স্পর্শ তো লাগল না উত্তপ্ত ললাটে! গভীর পরিতৃপ্তিতে তো ভরে উঠল না মনের পেয়ালা!

বরং কেমন একটা সব-খোয়ানো অবসন্নতা যেন ঘিরে ধরেছে তার সকল মনকে। কোন কিছুতেই আর সে উৎসাহ নেই, সে উত্তেজনা নেই। সব যেন স্তিমিত প্রদীপের ধূমাংকিত কালির আবরণে ঢাকা।

সমীর নিজের মনেই ভাবে : পথ চলায় শ্রান্তি এল, কিন্তু কই, শান্তির চক্রবাল-রেখা তো এখনও ধরা দিল না?

কিন্তু কেন এমন হল?

কোথায় গেল সমীরের এত উৎসাহ-উদ্যম?

মনের চোখে ঠুলি এঁটেই মানুষ পথ চলে। তাই অত্যন্ত স্থূল প্রত্যক্ষীভূত বাস্তব সত্যকেও সে অনেক সময় দেখতে পায় না। সমীরও পারে নি। নইলে অতি অনায়াসেই সে উপলব্ধি করতে পারত যে মলির উচ্ছৃংখল দায়িত্ববোধহীন জীবনযাত্রাই তার মনের এই বিষন্নতাবোধকে অংকুরিত করে তুলেছে।

কর্মক্লান্ত দিনের শেষে বাড়ি ফিরে সমীরের অন্তর চেয়েছে প্রিয়-তমার সেবা, যত্ন, পরিচর্যা। তার মন চেয়েছে, বাড়ি ফিরে সে দেখতে পাবে একখানি প্রতীক্ষারত প্রিয় মুখ।

কিন্তু হায়। দিনের পর দিন তার সে প্রত্যাশার মুখে ছাই পড়েছে। অবসন্ন সন্ধ্যায় গৃহে ফিরে সে পায় নি তার প্রিয়তমাকে। মলি তখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয় কোন নারী সমিতিতে নয় তো কোন পিকনিক-গার্ডেন পার্টিতে। ঘর-গৃহস্থালীর অতি ছোট গণ্ডীর মধ্যে জীবনটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখবার মেয়ে সে নয়। মুক্ত বিহঙ্গী সে। নীল আকাশের নিচেই তার সতত পক্ষবিধুনন।

সমীরের মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করতে চায়। ভাবে, স্পষ্ট করেই তার অভিযোগ সে জানাবে মলিকে। বলবে, সংসারের মঙ্গলময়ী মমতাময়ী লক্ষ্মীরূপে পাবার জন্যেই সে তাকে বিয়ে করেছিল, ট্যাক্সিচারিণী স্বাধীন আধুনিকা রূপে দেখবার জন্য নয়।

কিন্তু কিছুই সে তাকে বলে নি। বলতে পারে নি। সে জানে,

তাতে কোন লাভ হবে না। গৃহকপোতীর শিক্ষা মলির মজ্জায় নেই। আজ তাকে জোর করে বাঁধতে গেলে সংসারে অশান্তিই বাড়বে। সমস্যার সমাধান হবে না।

তাই নিজের ব্যথা নিজের বুকে বয়ে নিয়েই সে নিজের পথে চলে। হতাশা আর বেদনার দোলায় দুলতে দুলতে জীবনের কক্ষ-পথ হতে অবিরাম সরে সরে যায়।

সকলের অজ্ঞাতে বুঝি বা তার নিজেরও অজ্ঞাতে তিলে তিলে পরিবর্তিত হতে থাকে তার জীবনের রূপ ও পথ।

অন্যের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও অশ্রুর চোখে ধরা পড়ে সমীরের এই পরিবর্তন। সে বুঝতে পারে ছোট ভাইটির অন্তরের এই নীরব হাহাকার।

সমীরকে একলা পেয়ে অশ্রু একদিন বলল, দিন দিন তুই কি হয়ে যাচ্ছিস্ বল্ তো?

মৃদু হেসে সমীর জবাব দিল, কি হয়ে যাচ্ছি বল তো? কেন, আমার শরীর কি কিছু খারাপ দেখছ?

হাসির কথা নয় সমীর। সত্যি করে বল্ তো তোর কি হয়েছে?

কি আবার হবে? কিছুই হয় নি।

হয় নি বললেই হল? তুই কি ভাবিস আমি কিছুই বুঝতে পারি না। কোথায় গেল তোর চোখে-মুখে সেই তেজ। কোথায় গেল সেই হাসি।

দিদির দরদের ছোঁয়া লেগে সমীরের মনের গোপন মেঘ বুঝি বা গলতে শুরু করল। ভারী গলায় সমীর বলল, সত্যি দিদি, আজকাল কিছুই যেন আর ভাল লাগে না। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছি। কাজকর্ম সব কিছু কেমন অর্থহীন মনে হয়।

একটু চুপ করে থেকে অশ্রু আবার বলল, মলিকে তুই একটু বললেও তো পারিস। ঘরের বৌ এমন দিনরাত হুটহুট করে ঘুরে বেড়াবে এ বাপু আমারও ভাল লাগে না।

মাথা নিচু করেই সমীর জবাব দিল, বলে কিছু লাভ হবে না দিদি। ওকে আমি ভাল করেই চিনি। বাধা দিলে বরং আরও উল্টো ফল হবে।

সমীরের এই উদাসীনতা অশ্রুর ভাল লাগল না। বিরক্তির সুরে সে বলল, তা বলে তোর সুখ-সুবিধা সে একটুও দেখবে না? যে বাড়ির বৌ হয়ে এসেছে তাদের ভালমন্দর দিকে ফিরেও তাকাবে না?

তেমনি নির্বিকার কণ্ঠেই সমীর বলল, না তাকালে তুমি-আমি কি করতে পারি বল?

দৃঢ় কণ্ঠে অশ্রু বলল, বেশ, তুই বলতে না পারিস আমিই বলব। আমার চোখের সামনে তুই এমন করে দিনে দিনে শুকিয়ে যাবি সে আমি কিছুতেই হতে দেব না।

সমীর তবু আপত্তির সুরেই বলল, কথা বললেই কি আমার ভাগ্যকে তুমি ফেরাতে পারবে দিদি?

অশ্রুও তেমনি দৃঢ় স্বরেই বলল, পারব কি না জানি না। চেষ্টা করে তো দেখি।

সমীর বুঝল, অশ্রুকে এ সংকল্প থেকে বিরত করা যাবে না। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোন রকম আলোচনা করতেও তার ভাল লাগছিল না। তাই হাল ছেড়ে দিয়েই সে বলল. বেশ, কর তোমরা যা ভাল বোঝ। আমি জানি, আমার গাড়ির চাকা একবার যখন মাটিতে বসেছে আর তাকে টেনে তোলা যাবে না।

কথার শেষের দিকে সমীরের গলা বেশ ভারী হয়ে এল। অশ্রু তাই আর কোন কথা বলল না নীরবেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘর থেকে চলে গেল।

সংকট দেখা দিতেও বেশী দেরী হল না।

মলির স্বেচ্ছাচারিতাকে কেন্দ্র করে তিল তিল করে বেদনা স্তূপীকৃত হতে লাগল সমীরের মনে। আর সমীরের বেদনাকে কেন্দ্র করে তিল

তিল করে ক্ষোভের আগুন সঞ্চিত হতে লাগল অশ্রুর মনে। তারপর একদিন মনের গহনের সেই ধিকি ধিকি আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠল লেলি-শিখা বিস্তার করে।

অফিস থেকে সেদিন সকাল সকালই বাড়ি ফিরল সমীর। শরীরটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে হঠাৎ। মাথাটা যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়ে পড়ছে।

এসেই শুনল মলি বাড়ি নেই। দুপুরে খাওয়ার পরেই কোথায় বেরিয়েছে। কোথায় গেছে, কখন ফিরবে—কিছুই বলে যায় নি।

গভীর ক্ষোভে ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরে নিজের মনেই সমীর বলে উঠল, নাঃ, অবস্থা একেবারে অসহ্য করে তুলেছে।

ঘরে ঢুকে জামাজুতো ছেড়ে আলমারি খুলে একটা যন্ত্রণানাশক বড়ি খেল। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

কালীর মার কাছে খবর পেয়ে অশ্রু ঢুকল ঘরে। সমীরকে তেমনি ভাবে হাত-পা এলিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে সশংকিত গলায় বলে উঠল, কি হয়েছে রে সমীর, এমন ভাবে শুয়ে আছিস্ যে অসময়ে?

সমীর চোখ মেলে ক্লান্ত গলায় বলল, বিশেষ কিছু না। মাথাটা একটু ধরেছে, তাই—

এগিয়ে যেয়ে সমীরের কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, দেখি তো, জ্বরটর হয়নি তো? হুঃ, যা আশংকা করেছি, ঠিক তাই। এই তো কপালটা একটু গরম-গরম লাগছে।

কষ্টের মধ্যেও হেসে ফেলল সমীর। বলল, গরম আমার কপালে নয় দিদি, ও গরম বাসা বেঁধে আছে তোমার মনে।

কৃত্রিম রাগের সঙ্গে অশ্রু বলল, হয়েছে। তোমাকে আর কবরেজি করতে হবে না। তুই চোখ বুজে শুয়ে থাক। আমি তোর মাথাটা একটু টিপে দিচ্ছি।

বেশ, তাই দাও। না বললে তো তুমি শুনবে না।

কথা কয়টি বলে সমীর আবার চোখ বুজল।

পাশে বসে অশ্রু পরম স্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ধীরে ধীরে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সমীর। খুব সন্তর্পণে বিছানা থেকে নেমে দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে অশ্রু বাইরে এসে বসল।

ডাক্তারকে একটা খবর পাঠাতে পারলে ভাল হত। কিন্তু পাঠাবে কাকে? অরুণ কলেজে যাবার সময় বলে গেছে তার কলেজে একটা ফাংশন আছে সন্ধ্যায়, তার ফিরতে রাত হবে। সমীরকে একা বাড়িতে রেখে নিজেও যেতে পারে না। এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে সমস্ত রাগটা যেয়ে পড়ল মলির উপরে। মান-মর্যাদা লজ্জা-সংকোচের কথা দূরে থাক, স্বামী-সন্তানের প্রতি একটা কর্তব্যও তো আছে। সেই কোন্ দুপুরে বেরিয়েছে, বেলা গড়িয়ে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গেল তবু বাড়ি ফিরবার নাম নেই। নাঃ, সমীর যা ভাবে ভাবুক, আজ মুখোমুখী এর একটা সওয়াল অশ্রু করবেই।

কালীর মা এসে আলো জ্বেলে দিল ঘরের। চমকে দেয়ালের ঘড়ির দিকে চোখ ফেলল অশ্রু।

সাতটা বেজে গেছে।

চকিতে উঠে পড়ল সে। মৃদু পায়ে পাশের ঘরের ভিতর দিয়ে সমীরের শোবার ঘরের দরজটা ঈষৎ ফাঁক করে দেখল, সমীর অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঘুমের মধ্যেও ঠোঁট দুটো একটু বেঁকে রয়েছে। একটা যন্ত্রণার রেখা যেন কে টেনে দিয়েছে ঘুমন্ত চোখে-মুখে।

দরজা ভেজিয়ে আবার এসে বসল বাইরের ঘরে।

পামেলাকে ঘুম পাড়িয়ে আয়াও এসে বসল একটা সেলাই নিয়ে। রোজই বসে। দুজনে গল্পগুজব করে।

খানিক গম্ভীর ভাবে বসে থেকে অশ্রু জিজ্ঞাসা করল, তোমার মেমসাহেব কখন ফিরবেন বলতে পার?

আয়া বলল, আমাকে তো কিছু বলে যান নি।

আর কোন কথা বলল না অশ্রু। চুপচাপ বসে থেকে এক সময় আয়াও উঠে গেল তার ঘরে।

নির্জন নিস্তব্ধ ঘরে ঘড়ির দিকে চোখ রেখে ঠায় বসে রইল অশ্রু।

ঘড়ির কাঁটা দুটো বিষাক্ত সরীসৃপের মত নড়তে নড়তে একটার পর একটা অংক পার হয়ে এগিয়ে চলল। অশ্রুর মনের মধ্যেও ক্ষোভ ও ক্রোধের দুটো অনুভূতি যুগপৎ অস্থির ভাবে কিলবিল করতে লাগল।

ঘড়ির কাঁটা রাত এগারোটার ঘর ছুঁয়ে গেল।

সেদিকে চেয়ে অসহায় ক্ষোভে অশ্রুর সারা অন্তর যেন খানখান হয়ে ফেটে পড়তে লাগল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের গেটটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল।

বাইরের ভেজানো দরজাটা খুলে দাঁড়াল অশ্রু।

হাতের থলেটা হাল্কা ভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল মলি।

অশ্রু দরজা থেকে সরে না দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় প্রশ্ন করল, কোথায় ছিলে তুমি এত রাত অবধি?

সংকুচিত গলায় জবাব দিল মলি, বন্ধুদের সঙ্গে হোটেলে গিয়েছিলাম, এত রাত হয়ে গেছে খেয়াল হয় নি।

কিন্তু ঘরে তোমার স্বামী-সন্তান আছে সেটা খেয়াল না থাকবার মত ছেলেমানুষ তো তুমি নও।

অশ্রুর গলায় ভর্ৎসনার সুর। মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল মলির মন। চোখ তুলে বলল, কি বলতে চান আপনি?

বলতে চাই যে, গেরস্ত ঘরের বউ হয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত হোটেলে-পার্টিতে হৈ-হৈ করে বেড়াতে লজ্জা করে না তোমার?

লজ্জা! হঠাৎ যেন আগ্নেয়গিরির মত গর্জে উঠল মলি, গেরস্ত ঘরের বউ হয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত বাইরে কাটাই বলে আমার লজ্জা

হওয়া উচিত, তাই না? আর গেরস্ত ঘরের বিধবা হয়ে ঘরের মধ্যে সকলের চোখের সামনে ঢলাঢলি করলে বুঝি লজ্জা হয় না?

তীব্র আতংকে আর্তনাদ করে উঠল অশ্রু, কী—কী বললে তুমি?

ঠিকই বলছি। আমি কিছু অন্ধ নই, কালা নই। সবই দেখি, সবই শুনি। এতদিন শুধু চুপ করে ছিলাম। কিন্তু আজ যখন কথা তুলেছেন তখন আমিই বা ছেড়ে কথা কইব কোন্ ভয়ে? আমরা ফিরে আসায় না হয় দুদিন হল এ বাড়িতে তিমিরবাবুর যাতায়াতে একটু ভাঁটা পড়েছে। নইলে কী যে লীলাখেলা এ বাড়িতে চলছিল তা আর কারো জানতে বাকি নেই। পাড়াপড়শিরা কেন বাড়িতে ঢিল ছুঁড়েছিল বলতে পারেন?

অশ্রুর সমস্ত শরীর তখন থর্ থর্ করে কাঁপছে। দুই হাতে কান চেপে ধরে সে বলল, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এমন কথা তুমি মুখে আনতে পারলে?

কেন পারব না? ঝংকার দিয়ে উঠল মলি, আপনার ভয়ে নাকি? একলা বিধবা মেয়ে মানুষ একটা জোয়ান-মদ্দ ছেলেকে বাড়িতে ঠাঁই দিয়ে রাতের পর রাত কাটালে দশ জনে তাকে কি বলে সম্ভাষণ করে সেটা না বুঝবার মত কচি খুকী যে আপনি নন সেটা কি আপনি জানেন না।

জোড় হাত করে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে অশ্রু বলে উঠল, দোহাই তোমার মলি, তুমি চুপ কর। পাশের ঘরে সমীর ঘুমুচ্ছে। সে অসুস্থ। তার ঘুম ভেঙে যাবে। সে এ সব শুনলে—

কথার মাঝখানেই গর্জে উঠল মলি, ভাঙুক তার ঘুম। সে এসে ভাল করে শুনুক তার আদরের দিদির কীর্তি-কাহিনী।

মলি!

ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল সমীর। বলল, কী আরম্ভ করেছ তোমরা এই মাঝ রাতে? তোমরা কি ভুলে গেলে যে এটা ভদ্রলোকের বাড়ি?

তীব্রকণ্ঠে জবাব দিল মলি, না, ভুলি নি। আর সেই জন্যই তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, এই ভদ্রলোকের বাড়িতে তোমার দিদির আর জায়গা হবে না। তোমার দিদির আর তার সেই পাতানো ভাইয়ের।

সমীরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। মলির উগ্র স্পর্ধা, তার কুৎসিত ইঙ্গিত তাকে যেন মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় করে দিল। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই সম্বিত ফিরে পেল সে। গম্ভীর গলায় বলল, তুমি কি ভুলে গেলে যে এ বাড়িটা তোমার নয়, আমার।

পাল্টা জবাব দিল মলি, আর তুমিও কি ভুলে গেলে যে, যে-টাকার দৌলতে তুমি এ বাড়ির মালিক সে টাকাটা মাস মাস তুমি হাত পেতে নাও আমার বাবার কাছ থেকেই। তাঁরই দয়ায় পথ থেকে তুমি আজ ঘরে ঠাঁই পেয়েছ। নইলে কোন্ আস্তাকুড়ে এত দিন পঁচে মরতে!

পাল্টা জবাবে সমীর যেন কী একটা বলতে যাচ্ছিল। ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে মলিই কথা বলতে লাগল, থাক, তোমার মুখে কতকগুলো বড় বড় কথা শুনতে আমার আর ভাল লাগে না। কিন্তু একটা কথা তোমাকে আজ আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই। তোমার ওই দিদির সঙ্গে আর আমি এক ছাদের নিচে থাকতে পারব না। কিছুতেই না। কাজেই দিদিকে ছেড়ে থাকতে যদি তোমার কষ্ট হয় তাহলে দিদিকে নিয়েই থাক। কাল ভোরেই আমি মেলিকে নিয়ে বাবার কাছে চলে যাব।

চীৎকার করে উঠল সমীর, হ্যাঁ, তাই যেও। তোমার মুখ যেন সকালে উঠে আমাকে আর না দেখতে হয়।

বেশ, তাই হবে। আমিও দেখে নেব এত তেজ কোথায় থাকে।

কথা শেষ করেই দুমদাম্ করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল মলি। তাকে বাধা দিল অশ্রু। ঠাণ্ডা গলায় বলল, তার আর দরকার হবে না। আমিই চলে যাচ্ছি এ বাড়ি থেকে। চির-দিনের মত চলে যাচ্ছি।

যন্ত্রচালিত পুতুলের মত দরজার দিকে পা বাড়াল অশ্রু।

সমীর এগিয়ে যেতে যেতে ডাকল, দিদি।

আমাকে বাধা দিও না সমীর, আমাকে ফেরাতে পারবে না।

কিন্তু কোথায় যাচ্ছ তুমি?

যেদিকে দুচোখ যায়। শুধু তোমাদের সুখের কাঁটা হয়ে এখানে আর নয়।

বেশ তো, যেখানে যেতে হয় কাল সকালে যেও। এই মাঝ রাত্তিরে রাগের মাথায়—

দরজার কাছ থেকে ফিরে দাঁড়াল অশ্রু। তার দুচোখে তখন জলের ধারা নেমেছে। বলল, কার উপর রাগ করব বলো? রাগ করবার আমার কে আছে। তুমি বড় হয়েছ, তোমার ঘর-সংসার হয়েছে। এই দেখে যেতে পারছি, সেই আমার সুখ। আমি যাই।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেট খুলে পথে নামল অশ্রু। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। মধ্যরাত্রির আলো-আঁধারের মাঝে তার অপস্রিয়মান দেহটা এক সময় মিলিয়ে গেল।

তার পিছনে পিছনে বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত এসে হঠাৎ থমকে থেমে গেল সমীর। আর একটি পদক্ষেপ করবার শক্তিও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। হারিয়ে ফেলেছে ক্ষীণ কণ্ঠে একটিবার মাত্র দিদি বলে ডাকবার শক্তিটুকু পর্যন্ত।

অন্ধকার পথের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে ভূতে-পাওয়া মানুষের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সমীর। হুঁশ হল মলির কথায়।

মলি তার কাঁধে হাত রেখে ডাকল, ভিতরে চল।

মুখ ফেরাল না সমীর। বাঁ হাত দিয়ে মলির হাতখানা কাঁধ থেকে সরিয়ে দিয়ে ভেজা গলায় বলল, সংসারে আমার একটিমাত্র আশ্রয় ছিল তাও তোমরা ছিনিয়ে নিলে?

মলি এ অভিযোগ গায়ে মাখল না। সান্ত্বনার সুরে বলল, অবুঝ হয়ো না সমীর। তুমি কেন বুঝতে পারছ না যে এ-বাড়িতে

তোমার দিদির মন টিকছিল না। তিমিরবাবুকে তিনি ভালবাসেন, তাকে ছাড়া—

থামো! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমকে উঠল সমীর। তারপরই সুর নামিয়ে বলল, তুমি যাও মলি, তুমি ভিতরে যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

বেশ। অ্যাজ ইউ প্লিজ। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। আ'ম অফুলি টায়ার্ড।

টেনে টেনে কথাগুলো বলতে বলতে ভিতরে চলে গেল মলি। সমীর তেমনি ভাবে একাই দাঁড়িয়ে রইল।

এমন সময় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল গেটের সামনে।

চমকে উঠল সমীর। সাগ্রহে এগিয়ে গেল। দিদি বুঝি ফিরে এসেছে নিজের ভুল বুঝতে পেরে।

ট্যাক্সি থেকে নামল তিমির। ভাড়া না মিটিয়ে দিয়েই গেট খুলে ভিতরে ঢুকল।

সামনেই সমীরকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। বলল, কি ব্যাপার সমীর? এত রাতে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?

সমীর কোন জবাব দিতে পারল না। তিমিরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

কি হয়েছে বল তো? তোমার দিদি কোথায়?

কি জবাব দেবে সমীর? ঢোক গিলে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, দিদি—মানে দিদি—নেই।

নেই! আর্তনাদ করে উঠল তিমির, কী বলছ তুমি? খুলে বল। অশ্রু কোথায়? কি হয়েছে তার? বল বল।

সংক্ষেপে সব কথা জানাল সমীর। শুনে বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল তিমিরের। সে যে অনেক আশা নিয়ে ছুটে এসেছে। শেষে কি তীরে এসে তরী ডুববে? ব্যর্থ হবে এত দীর্ঘ প্রতীক্ষা? অশ্রু কি শেষটায় আত্মঘাতী হল?

সাগ্রহে তিমির প্রশ্ন করল, কিন্তু সে গেল কোথায় এত রাতে ?

কোন জবাব নেই সমীরের মুখে।

আর তোমরাই বা তাকে যেতে দিলে কেন ?

তাঁকে ফেরাবার মুখ আমার ছিল না তিমিরদা।

ফেরাবার মুখ ছিল না! তিমিরের গলায় এবার বিস্ময়। কী এমন অঘটন ঘটল যে এই রাতের বেলায় একলা সে পথে বেরিয়ে গেল ?

সে অনেক কথা তিমিরদা। সে-কথা তোমাকে আমি বলতে পারব না।

অসহায় ক্রোধ উথলে উঠল তিমিরের গলায়, অথচ নিজের দিদিকে সে কথাগুলো বলতে তোমাদের আটকায় নি। কিন্তু তোমাকে আর বলতে হবে না। তোমরা না বললেও আমি আন্দাজ করতে পারি কোন্ কথার বিষ তাকে আজ ঘরছাড়া করেছে। কিন্তু আর কয়েকটা ঘণ্টাও কি তোমরা অপেক্ষা করতে পারলে না ? তাহলেই যে তোমাদের জিভের সব বিষ আমি নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারতাম।

ব্যাকুল কণ্ঠে সমীর বলে উঠল, কী বলছ তুমি তিমিরদা ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝে আর তোমাদের দরকার নেই। তুমি তোমার ধনীর দুলালীকে নিয়েই থাক। দুখিনী দিদিকে দিয়ে তোমার কোন দরকার নেই আজ। কিন্তু তোমাকে এ সব কথা বলা আজ বৃথা। আমি চললাম। যদি তাকে জ্যান্ত ফিরিয়ে আনতে পারি তবেই তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। নইলে এই শেষ।

দ্রুত পদক্ষেপে গেট পেরিয়ে তিমির ট্যাক্সিতে চেপে বসল। বিভ্রান্ত বিমূঢ় সমীরের মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বের হল না। তিমিরের রহস্যময় কথাগুলোর মধ্যেই সে ঘুরে বেড়াতে লাগল দিশে-হারার মত।

॥ উনিশ ॥

জনবিরল রাতের কলকাতার পথে পথে ছুটে বেড়াতে লাগল তিমিরের ট্যাক্সি। স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে গঙ্গার ধারে ধারে। প্রায় প্রতিটি ঘাটেই নেমে নেমে সে খুঁজতে লাগল অশ্রুকে। গঙ্গায় তখন ভাঁটার টান। জল নেমে গেছে অনেক নিচে। সিঁড়ি ভেঙে নামল সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে। এখানে-ওখানে যাকে দেখতে পেল তাকেই জিজ্ঞাসা করল অশ্রুর হদিশ। কিন্তু কোন ফল হল না। কোথাও এতটুকু নিশানা পর্যন্ত সে রেখে যায় নি। মিথ্যা কলংকের অগ্নিজ্বালাকে নিঃশেষে মুছে ফেলে চলে গেছে সব দাহের ওপারে।

অবারণ অশ্রুধারায় ভেসে যেতে লাগল তিমিরের দুই চোখ।

গঙ্গার তীর ছেড়ে আবার ফিরে গেল রাজ পথে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে খানিক ঘুরল এ-পথে সে-পথে।

এ তুমি কী করলে অশ্রু? সব প্রতীক্ষার সব স্বপ্নের এমন অকাল সমাধি রচনা করলে মুহূর্তের আবেগে? তুমি কি ভুলেও তিমিরের কথাটা একবার ভাবলে না? কেন ভাবলে না যে, তোমাকে উদ্ধারের পারোয়ানা হাতে নিয়ে তোমারই আশায় আমি ছুটে এসেছিলাম? এ-ভুল তুমি কেন করলে অশ্রু? তোমার এত বুদ্ধি, এত ধৈর্য্য, এত সহিষ্ণুতা—একটা মিথ্যার আঘাতে সব ধুলোয় গুড়িয়ে দিলে?

ঘুরতে ঘুরতে পথ এক সময় শেষ হল।

মানুষের চোখের জলের যদি বা অন্ত না থাকে, অন্ত আছে ব্যর্থ অন্বেষণের বিষন্ন রাত্রির। কলকাতার রাতও এক সময় শেষ হল। ঘুমন্ত রাজধানীর ঘুম ভাঙল। রাত্রির আবর্জনা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিতে পথে পথে বের হল হোস-পাইপওয়ালার দল।

মনের সমস্ত বেদনার আবর্জনা মনের মধ্যেই পুষে নিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে এক সময় মেসে ফিরল তিমির।

সিঁড়ি ভেঙে দোতলার বারান্দায় পা দিয়েই চমকে উঠল তিমির।

রাত্রি কি প্রভাত হল ?

অন্ধকারের ওপারে কি আবির্ভূত হল হিরণ্যপানি ত্বিষাম্পতি ?

সব সন্দেহ সব আতংক সব বেদনার কি অবসান হল ?

বারান্দায় তিমিরের ঘরের সামনে হেলানো বেঞ্চিটাতে পাশাপাশি বসে আছে অশ্রু আর অরুণ।

তিমিরকে দেখেই অরুণ সানন্দে চীৎকার করে উঠল, এই যে দাদা এসেছেন।

মনের অপরিসীম আনন্দকে মনের মধ্যে চেপে রেখে তিমির এগিয়ে যেতে যেতেই বলল, তোমরা এখানে ?

বিষন্ন গলায় অশ্রু বলল, এখানে ছাড়া আর কোথায় যাব তিমির ? পৃথিবীতে আর সব দরজাই যখন আমার কাছে বন্ধ হয়ে গেল বড় আশা নিয়ে তখন তোমার কাছেই ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু এমনি কপাল আমার, এসে দেখি এ দরজাও বন্ধ।

ঘরের তালা খুলতে খুলতে তিমির বলল, অথচ কী আশ্চর্য, সারাটা রাত কলকাতার পথে পথে আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়িয়েছি। উঃ, কী দুশ্চিন্তায়ই যে রাতটা আমার কেটেছে। কেবলি থেকে থেকে বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠেছে, আর বুঝি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল না।

অধীর আনন্দে অশ্রুর সর্বাঙ্গ বুঝি থর থর করে কাঁপছে। তিমির তাকে খুঁজেছে সারা রাত, এ আনন্দ সে রাখবে কোথায়। তবু সে আনন্দের বিহ্বলতাকে মনের কোণে চেপে রেখেই সে বলল, কী বলছ তুমি তিমির ? সারা রাত তুমি আমাকে পথে পথে খুঁজতে গেলে কেন ? তুমি কেমন করে জানলে যে আমি ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছি ?

মৃদু হেসে তিমির বলল, সবই আমি জানি অশ্রু। কাল রাতে তোমাদের বাড়ি যেয়ে সমীরের কাছেই সব জানতে পারি। কিন্তু কী বোকা আমি দেখ, সারা কলকাতার পথঘাট চষে বেড়ালাম, তন্ন তন্ন

করে খুঁজলাম গঙ্গার প্রতিটি ঘাট, অথচ এ কথা একবারও আমার মনে হল না যে অশ্রু যদি ঘর থেকে বেরিয়ে থাকেই তবে আমার ঘরে আসবার জন্যেই বেরিয়েছে।

বাহাদুরী নেবার ভঙ্গীতে অরুণ বলে উঠল, আমি কিন্তু ঠিক ধরে-ছিলাম দাদা যে দিদি আপনার এখানেই এসেছে। তাই তো কলেজ থেকে ফিরে যখন শুনলাম বৌদির উপর রাগ করে দিদি কোথায় যেন চলে গেছে, তখন আর কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা চলে এসেছিলাম আপনার বোর্ডিংএ। এসে দেখি, ধরেছি আমি ঠিক। দিদি হাজির। কিন্তু ঘর তালাবন্ধ। অগত্যা বাইরের ওই বেঞ্চিতে বসে বসেই রাত কাবার।

অশ্রু বলল, কিন্তু একটা ব্যাপার যে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না তিমির। কাল এত রাতে তুমি হঠাৎ আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলে কেন? তোমাদের বোর্ডিংএর কড়া নাড়তে যে ভদ্র-লোকটি বেরিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিলেন তার মুখে শুনলাম রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ বোর্ডিংএ ফিরেই একটা টেলিগ্রাম পেয়ে নাকি তক্ষুনি তুমি কোথায় চলে গেছ। কী ব্যাপার বল তো? কোন দুঃসংবাদ নয় তো?

তিমির জবাব দিল, খবরটা খারাপই। বাবা মৃত্যুশয্যায়। তিনিই টেলিগ্রাম করিয়েছেন আমাকে যাবার জন্যে।

অশ্রু ব্যাকুলকণ্ঠে বলল, বল কি? বাবা মৃত্যুশয্যায় আর তুমি এখনও বাড়ি রওনা হও নি?

তিমির বলল, টেলিগ্রামটা এখানে আসে রাত সাতটায়। কিন্তু আমার হাতে আসে রাত এগারোটায়। বোর্ডিংএ ফিরতে কাল আমার দেরী হয়েছিল। তখন আর রওনা হবার কোন ট্রেন ছিল না। তাছাড়া টেলিগ্রামটা পেয়েই মনে হল, বাবাকে দেখতে বাড়ি যদি যাই-ই তাহলে তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাব।

আমাকে? বিস্ময়ে ও আনন্দে ভেঙে পড়ল অশ্রু।

হ্যাঁ, তোমাকে। বাবার উপর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে যেদিন চলে আসি সেদিন বলে এসেছিলাম, বাবা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন সে বাড়িতে আমি যাব না। আর তোমার সঙ্গেও কোন সম্পর্ক আমি রাখব না। আজ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে সে প্রতিজ্ঞার দায় থেকে তিনি আমাকে উদ্ধার করেছেন। তাই শেষ সময়ে তোমাকে সঙ্গে নিয়েই তাঁর কাছে যেয়ে আমি দাঁড়াতে চাই। তিনি জেনে যেতে পারবেন যে তোমাকে নিয়ে বেলেল্লাপনা আমি করি নি, স্ত্রীর যোগ্য মর্যাদা দিয়েই তোমাকে গ্রহণ করেছি।

তিমির!

একটিমাত্র উচ্ছ্বসিত আকুল ডাকের ভিতর দিয়েই অশ্রু তার হৃদয়ের সব আনন্দ সব কৃতজ্ঞতা সব শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিমিরের পায়ের উপর নত হয়ে প্রণাম করল।

তার মাথায় কম্পিত হাতখানি রেখে গভীর প্রশান্তিতে দুই চোখ বুজল তিমির। মনে মনে কি বলল তা সেই জানে। তারপর চোখ খুলে বলল, কিন্তু আর দেরী নয় অশ্রু, তুমি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। প্রথম ট্রেনেই আমাদের রওনা হতে হবে। অরুণ, তুমিও রেডি হও।

আমি!

হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি শ্রীমান অরুণ চন্দ্র। আরে ভাই এক যাত্রায় কি আর পৃথক ফল হয়? দিদির সাথে সারা রাত এক বেঞ্চিতে বসে কাটিয়েছ, আর রেল গাড়িতে উঠে এক বেঞ্চিতে বসবে না, তাও কি কখনও হয়?

॥ কুড়ি ॥

নিরবধি কাল। পৃথিবী বিপুল।

অঙ্গুলি থেকে বিঘৎ, বিঘৎ থেকে হাত, হাত থেকে মাইল যোজন পার হয়ে দিগন্ত হতে দিগন্ত পর্যন্ত পৃথিবীর সুদূর বিস্তার।

আবার দণ্ড থেকে প্রহর, প্রহর থেকে দিন, দিন থেকে মাস বর্ষ যুগ কল্প পার হয়ে কালের সীমাহীন পরিক্রমা।

সেই পরিক্রমার পথে কত স্বপ্ন-মন্দির গড়ে ওঠে মানুষের কামনায় আর সাধনায়। আবার প্রবল ঝড়ের তাড়নায় কত সুখের নীড় ভ্রষ্ট-শাখা হয়ে ধূলায় গুড়িয়ে যায়।

সুখ-দুঃখ বেদনা-আনন্দের প্রতি সমউদাসীনতায় মহাকাল এগিয়ে চলে তার অন্তহীন পথ-পরিক্রমায়।

তিমির আর অশ্রু, সমীর আর মলি।

পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়েও নিজ নিজ গতানুগতিক প্রাত্যহিকতার পথে এগিয়ে চলতে চলতেই একদিন তাদের জীবনও মহাকালের পথের ধূলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে।

হয়ও তাই।

বাড়ি পৌঁছে অধীরপ্রসন্নর সঙ্গে আর দেখা হয় নি তিমিরের। তারা পৌছবার আগেই তিনি ওপারের পথে যাত্রা করেন। অশৌচান্তে যথাসময়ে তিমির অশ্রুকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করে অধীরপ্রসন্নর পল্লী-ভবনেই সুখী দাম্পত্য জীবনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেখান-কার জমিজমা পরিদর্শন করে আর সাধ্যমত পল্লীর সেবা ও সংস্কার করে পরম সুখেই তাদের দিন কাটছে।

ইতিমধ্যে বি, এস-সি পাশ করে অরুণ চলে গেছে আমেরিকায়

কৃষি-বিদ্যা শিখতে। খরচ অবশ্য তিমিরই জুগিয়েছে তার বাবার জীবন-বীমার মোটা টাকা থেকে।

এদিকে সমীর আর মলির জীবনও আর দশটা উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের মতই একঘেয়ে তালে এগিয়ে চলেছে। গভীর শ্রান্তি আর নিরাসক্তির ভিতর দিয়েই চাকরির চাকা সে প্রাণপনে ঠেলে চলেছে। মলিও কন্যা ও সংসারের জোয়াল আয়ার ঘাড়ে চাপিয়ে নির্বিবাদে ক্লাব-পিকনিক-পার্টির স্রোতে ভেসে চলেছে।

অশ্রু মাঝে মাঝে চিঠি লিখে সমীরের শারীরিক কুশলতার খবর নেয়। নিজে সংসারের জালে জড়িয়ে পড়ার কৈফিয়ৎ দিয়ে তাদের পল্লীভবনে বেড়িয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানায়। সমীরও দুছত্রের সংক্ষিপ্ত জবাবে অক্ষমতা জানায়—কাজের চাপ এত বেশী যে কিছুতেই যাওয়া সম্ভব নয়। সুযোগ পেলেই সে যাবে।

এমনি করেই দিন যায়।

হয়তো যেতও।

কিন্তু কোথায় বসে কোন্ খেয়ালী বিধাতাপুরুষ কী যে কলকাঠি নাড়ল, সব বিধি-ব্যবস্থা একেবারে উল্টে-পাল্টে গেল।

জার্মেনী থেকে নতুন আমদানী করা একটা ভারী মেশিন 'ফিট' করতে যেয়ে সমীর দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসল। ডান পায়ে এবং মাথার ডান দিকটায় চোট লাগল খুব বেশী। ডান চোখটার জখম গুরুতর। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কারখানা থেকেই তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

খবর পেয়ে মিঃ মজুমদার এলেন। মলি এল। ডাক্তার নার্সের সবরকম ব্যবস্থা হল। একদিন এক রাত অজ্ঞান থাকবার পর ধীরে ধীরে চৈতন্য ফিরে এল।

ডাক্তার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। প্রাণের ভয় আর নেই। তবে ডান পা আর ডান চোখটার কি হবে এখনও বলা শক্ত। দীর্ঘ দিন চিকিৎসাধীন থাকতে হবে।

মিঃ মজুমদার সমীরকে নিজের বাড়িতেই নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু আপত্তি করল সমীর। অনেক বুঝিয়েও কিছুতেই তার মত করানো গেল না। সমীরের প্রবল আপত্তি। তার একান্ত জিদ—হাসপাতালেই থাকবে।

অগত্যা হাসপাতালের কেবিনেই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হল।

দুর্ঘটনার খবর যথারীতি কাগজে ছাপা হল। আর যথাসময়ে সে খবর পড়ে সব মান-অভিমান তুচ্ছ করে অশ্রু ছুটে গেল কলকাতায় রুগ্ন ভাইকে দেখতে।

হাসপাতালের কেবিনে যখন পৌঁছুল অশ্রু, সমীরের তখন একটি চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, একটি পা প্ল্যাস্টারের বাঁধনে আবদ্ধ।

ডুকরে কেঁদে উঠল অশ্রু, এ তুই কী করেছিস্ সমীর, এ তুই কী করেছিস্।

সমীরের চোখ বেয়েও জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। উদ্গত অশ্রুর আবেগে কোন কথাই সে বলতে পারল না। বাঁ হাতটা শুধু নিজের কপালে ঠেকাল একবার।

অশ্রু মাথা নেড়ে বলল, না না, ভাগ্যের দোহাই দিয়ে তুই আমাকে ভোলাতে পারবি নে। আমি জানি রে জানি, নিজেকে নষ্ট করবার জন্য ইচ্ছা করেই এ কাণ্ড তুই করেছিস। কিন্তু কার উপর এ অভিমান তুই করলি ভাই, কে এর মূল্য বুঝবে!

নার্স এসে অশ্রুকে ডেকে বাইরে নিয়ে গেল। এ অবস্থায় অত্যধিক উত্তেজনায় রোগীর ক্ষতির সম্ভাবনা।

কয়েকদিন কলকাতায় কাটাল অশ্রু। হোটেলেই রইল। মলি এসে অনেক অনুরোধ জানাল মিঃ মজুমদারের বাড়িতে যেতে, সে গেল না। বলল, মাত্র কয়েকটা দিন তো থাকব, এর জন্যে আর তোমাদের বিরক্ত করতে চাই না।

সমীরের দুর্ঘটনার পর থেকেই মলির চরিত্রের একটা আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে। কোথায় গেছে তার সেই উদ্ধত স্বেচ্ছাচার আর

উচ্ছৃংখল চাপল্য। সে আজ ধীর গম্ভীর বিষন্নভার প্রতিমূর্তি যেন।

সজল চোখ মেলে মলি বলল, জানি আমাকে ক্ষমা করতে আপনি কোনদিনই পারবেন না। আর ক্ষমা চাইবার মুখও আমার নেই। কিন্তু দিদি, আপনি ক্ষমা না করলে আমার সংসার যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

অশ্রু বলল, ছিঃ মলি, এমন কথা বলতে নেই, এতে অকল্যাণ হয়।

অকল্যাণের আর কি বাকি আছে দিদি! আমি তো জানি, এ সবই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

মলির চোখে জল দেখে অশ্রুর মনটা একটু নরম হল। সান্ত্বনার সুরে সে বলল, এটা তোমার মনগড়া কথা মলি। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই তার সঙ্গে কারও পাপ-পুণ্যের কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু আমার মন যে কিছুতেই মানে না। কেবলই মনে হয়, আপনার প্রতি যে দুর্ব্যবহার আমি করেছি এ সব তারই ফল। আপনি আমাদের ক্ষমা না করলে না জানি আরও কি সবনাশ আমার কপালে আছে।

ছিঃ মলি, ও সব অলক্ষুনে কথা ভাবতে নেই। এ বিপদে তুমি ধৈর্য হারালে চলবে কেন? সমীরের তো এই অবস্থা, তুমি পাশে দাঁড়িয়ে তাকে শক্তি না জোগালে সে দাঁড়াবে কিসের জোরে? আর আমার ক্ষমা? দোষ অপরাধ তোমরা যতই করে থাক, আমি ক্ষমা করলেই যদি তোমার মনে শান্তি ফিরে আসে, যদি সমীরের কল্যাণ হয়, তাহলে সে ক্ষমা যে তুমি না চাইতেই আমি করে আছি বোন।

আঃ, আপনি আমাকে বাঁচালেন দিদি, আপনি আমাকে বাঁচালেন।

কথা শেষ করে গলায় আঁচল জড়িয়ে মলি অশ্রুকে প্রণাম করল। দুই হাতে তুলে ধরে অশ্রু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

।। একুশ ।।

কয়েক মাস পরে।

সবে সূর্য উঠেছে। শিশির ধোঁয়া গাছের পাতাগুলো ঝিলমিল করছে। পাখি ডাকছে ডালে ডালে।

মাটির দাওয়ায় একটা বেতের মোড়ায় বসে জবাকুসুমসংকাশ সূর্যের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সমীর। পিছনে বাঁশের বেড়ার গায়ে ঠেসান দেওয়া রয়েছে একটা কাঠের ক্রাচ্।

সমীর এখন প্রায় সুস্থ। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে কয়েক মাস আগে। কিন্তু একটি চোখ আর একখানি পা তাকে হাসপাতালেই রেখে আসতে হয়েছে। ডান চোখের দৃষ্টি তার চিরদিনের মত নিভে গেছে। ডান পাটা আছে যথাস্থানে, কিন্তু একেবারেই অচল। ডান বগলে একটা ক্রাচ্ এসে তার কাজের ভার নিয়েছে। তবু মন্দের ভাল ডান হাতটা কোন রকমে অক্ষত অবস্থায়ই রক্ষা পেয়েছে।

বসে বসে সেই সব দিনের কথাই ভাবছিল সমীর।

হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবার নোটিশ হয়ে গেছে। ছ'এক দিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরে যেতে হবে।

বিকেল বেলা চুপচাপ বিছানায় শুয়ে ছিল সমীর। ঘরে ঢুকল মলি। হাতে একটা ছোট টিফিন ক্যারিয়ার। তাতে কিছু খাবার আর ফল। রোজই আনে। সমীর অনেক আপত্তি করেছে। মলি তাতে কান দেয় নি।

কেমন আছ আজ? স্মিত হাসির সঙ্গে মলি প্রশ্ন করল।

মৃদু হেসে জবাব দিল সমীর, তোমরা সবাই মিলে যে ভাবে আমাকে নিয়ে পড়েছ তাতে ভাল না থেকে আর উপায় কি বল?

সমীরের কপালে আল্‌তো ভাবে হাত বুলিয়ে দিয়ে মলি বলল, না না, সত্যি তোমার চোখ-মুখ বলছে তুমি বেশ ভাল আছ। তাছাড়া ডাক্তারবাবুও তো বলেছেন শিগ্‌গিরই তোমাকে ছেড়ে দেবেন। হ্যাঁ, ভাল কথা, আজ হেঁটেছিলে একটু ক্রাচটা নিয়ে?

ঘাড় নেড়ে সমীর বলল, না।

এটা কিন্তু অন্যায় করেছ তুমি। একটু একটু করে অভ্যাস না করলে ক্রাচে ভর দিয়ে হাটতে পারবে কেন?

হাটতে আর আমি কোন দিনই পারব না মলি! সমীরের গলা নৈরাশ্যে স্তিমিত।

কে বলেছে তোমাকে! ডাক্তারবাবু বলেছেন তুমি ঠিক হাটতে পারবে।

না, পারব না। সমীরের গলার স্বর উত্তেজনায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল এবার। যা পারব সেটার নাম হাটা নয়, খোঁড়ানো। সেই খুঁড়িয়েই সারাটা জীবন আমাকে চলতে হবে।

সমীরের শরীর তখনও বেশ দুর্বল। মেজাজটাও কেমন যেন খিট-খিটে হয়ে উঠেছে। অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য মলি তাই টিফিন-ক্যারিয়ারের ঢাকনা খুলে খাবার বের করে দিল। হাত পেতে খাবারটা নিয়ে একটু একটু খেতে লাগল সমীর।

খানিক পরে মলি বলল, জান, একটা সুখবর আছে।

চোখ তুলে তাকাল সমীর। কোন কথা বলল না। বোঝা গেল তার মনের ক্ষোভ তখনও যায় নি।

একটু ইতস্তত করে মলি আবার বলল, ডাক্তারবাবু তোমাকে কিছু দিনের জন্য কোথাও চেঞ্জে যেতে বলেছেন তো? তা বাবা সে টাকাটা দিতে রাজী হয়েছেন।

কঠিন গলায় সমীর বলল, তোমার বাবার উদারতার সীমা নেই। কিন্তু ও টাকা আমি নিতে পারব না মলি।

কিন্তু ও টাকা নেওয়া ছাড়া যে আর কোন উপায় নেই।

নিরুপায় বলেই তো ও টাকা আমি নিতে পারি না।

ওঃ! বলে চুপ করল মলি।

একটু চুপ করে থেকে সমীর আবার বলতে লাগল, তুমি অবুঝ হয়ো না মলি। আমার দিকটাও ভাল করে ভেবে দেখ। এমনিতেই তো তাঁর স্নেহের উপর অনেক অত্যাচার আমি করেছি। আমার এই এত বড় অসুখের খরচ, তোমার আর মেলির খাওয়া-পরার খরচ সবই তো তিনি অকাতরে দিয়েছেন। হয় তো অক্ষম হয়ে বেঁচে থেকে আরও অনেক তাঁর কাছ থেকে নিতে হবে। তার উপর এই সখের চেঞ্জে যাবার জন্য তাঁর কাছ থেকে টাকা আমি নিতে পারব না। সে অনুরোধ তুমি আমাকে করো না।

অসহায় ভাবে মলি বলে উঠল, তাহলে কি চেঞ্জে যাওয়া হবে না?

দৃঢ় কণ্ঠে সমীর জবাব দিল, না, হবে না।

এরপর আর কোন কথা বলে নি মলি। হাসপাতালের ঘণ্টা না পড়া পর্যন্ত চুপ করেই বসে ছিল ছোট টুলটায়। তারপর টিফিন-ক্যারিয়ারটা হাতে নিয়ে ধীরে পায়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজল সমীর। ঝড়ের হাওয়া লাগা ঝরা পাতার মত স্মৃতির পাতাগুলো চোখের সামনে উড়ে যেতে লাগল।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের বাড়িতেই ফিরে গেল সমীর। মিঃ মজুমদারের অনেক অনুরোধেও তাঁর বালীগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে উঠতে কিছুতেই রাজী হল না।

মাসখানেক নির্বিবাদেই কেটে গেল। সমীর সব সময় চুপচাপই থাকে। হয় বিছানায় নয় বারান্দায় ইজি-চেয়ারে। সংসারের চাকা তখন মলির হাতে। সে যেমন ভাবে চালায় তেমনি চলে। সমীর সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না।

কিন্তু এরই মধ্যে একদিন ঝোঁকের মাথায় এমন কাণ্ড সে করে বসল যাতে সংসারের চাকা একেবারেই অচল হয়ে পড়ল। মলির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

ঘরে ঢুকে মলি অসহায় ভাবে বলল, এ তুমি কি করেছ?

ঠিকই করেছি।

না, ঠিক কর নি। তুমি কোম্পানীতে চাকরি কর। তোমার এই অবস্থা বিবেচনা করে কোম্পানী তোমার জন্যে যে ব্যবস্থা করেছে সেটা মেনে নেওয়াই তোমার উচিত ছিল।

না, উচিত ছিল না। কোম্পানীতে আমি একজন পদস্থ অফিসার ছিলাম। দুর্ঘটনার ফলে আজ আমি সে পদে থাকবার সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়েছি। তাই কোম্পানী দয়া করে একটা কর্মহীন নতুন পোস্ট তৈরী করে আমাকে তাতে বাহাল করেছে। অর্থাৎ কোন কাজকর্ম না করেই আমি যাতে কোম্পানীর টাকায় বসে বসে খেতে পারি তাঁরা তার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তুমি কি বলতে চাও এ অসম্মান আমি মাথা পেতে নেব?

কিন্তু এতে অসম্মানের কি আছে আমি তো বুঝতে পারছি না। তুমি তো আর হাত পেতে তাঁদের কাছে কিছু চাও নি। তাঁরা নিজের থেকেই এ প্রস্তাব করেছেন।

মনকে চোখ ঠেরে কোন লাভ নেই মলি। প্রস্তাব যে তাঁরা নিজের থেকে করেন নি তা তুমিও জান আমিও জানি।

কি বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে এর সবটাই তোমার বাবার হাতে করা। সরাসরি তাঁর দেওয়া টাকা আমি নিতে চাই নি বলেই তিনি পিছন থেকে শব্দভেদী বাণ মেরেছেন। আর সেই জন্যেই কোম্পানীর সে প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। শুধু তাই নয়, আমার আগেকার চাকরিতেও আমি স্বেচ্ছায় সুস্থ মনে পদ-ত্যাগ করে কোম্পানীকে চিঠি দিয়েছি।

সেদিন আকাশ ভেঙে পড়েছিল মলির মাথায়। এই অক্ষম অসহায় মানুষটিকে সে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখবে তাহলে? কেমন করে মানুষ করে তুলবে পামেলাকে?

কোন দিকে কোন পথের হদিশ না পেয়েই অশ্রুকে চিঠি লিখে সব কথা সে জানিয়েছিল। লিখেছিল, এখন আমি কি করব আপনই বলে দিন দিদি।

চিঠি পেয়েই অশ্রু নিজে এসেছিল সমীরের বাড়িতে। তিমিরও এসেছিল তার সঙ্গে। সমীরকে তারা অনেক বুঝিয়েছিল, কলকাতার বাস তুলে দিয়ে তাদের সঙ্গে ফিরে যেতে। কিন্তু সমীর কিছুতেই রাজী হয় নি। তার সেই এক জিদ, যদি না খেয়ে মরতেও হয় তবু কারও কৃপার ভিখারী হয়ে সে বাঁচতে চায় না।

সমীরের শরীর তখনও বেশ দুর্বল। মেজাজ আরও খিটখিটে। অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অল্প উত্তেজনায়ই হাঁফিয়ে পড়ে। তাই এ নিয়ে তার সঙ্গে বেশী কথা বলাও চলে না। অগত্যা নিরাশ হয়েই ফিরে গেল অশ্রু ও তিমির। মলিকে আড়ালে বলে গেল, সমীরের মন একটু নরম হলেই যেন তাদের খবর দেয় সে। তাহলেই তারা এসে সব ব্যবস্থা করবে। কোন ভয় নেই। কিছু টাকাও তারা গোপনে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মলি সে-টাকা নেয় নি।

সমীরের যে-টাকাটা ব্যাংকে সঞ্চিত ছিল তাই দিয়েই অনেক কষ্ট সয়েও ছোট সংসারটাকে সে মাথায় করে নিয়েছিল। আয়াকে ছাড়িয়ে দিয়েছিল সমীর হাসপাতাল থেকে ফিরে আসবার আগেই। একমাত্র কালীর মার সহায়তায়ই সংসারের সব কাজ সে নিজের হাতেই করে নেয়।

কিন্তু যতই সামলে চলুক, সমীরের যে সামান্য সঞ্চয় ছিল ফুটো কলসির জলের মত দিনের পর দিন হ্রাস পেতে পেতে একদিন তা তলানিতে এসে তো ঠেকবেই, তখন কি হবে? সে দুর্দিনকে মলি রোধ করবে কোন্ যাদুর বলে?

অশ্রুর নির্দেশ মতই সুযোগ মত মলি একদিন কথাটা পাড়ল। ধীর গলায় বলল, এ ভাবে চললে ব্যাংকের টাকায় আর কদিন চলবে বল তো?

ম্লান হেসে সমীর বলল, যেদিন না চলে আর চলবে না।

না না, অমন করে হেসে তুমি কথাটা উড়িয়ে দিও না! যাহোক একটা বিহিত এখন থেকেই ভাবা উচিত।

কিন্তু সে কথা আমাকে বলছ কেন? আমি যে সব ভাবনা-চিন্তার একেবারে বাইরে সে কি তুমি জানি না?

না, জানি না। আমি জানি, এ সংসার তোমার। সুদিনেও যেমন ছিল, আজ দুর্দিনেও তেমনি আছে।

বেশ। আমাকে কি করতে বল তুমি?

সমীরের এ কথায় একটু বুঝি অভিমান হল মলির। এই কয়েক মাস ধরে মলির একটা কথাও যে শোনে নি সে কি না আজ তার কাছেই চাইছে পথের নির্দেশ! গম্ভীর গলায় মলি বলল, করতে আমি তোমাকে কিছুই বলি না। কিন্তু বেঁচে থাকবার একটা ব্যবস্থা তো আমাদের করতে হবে। বাবার টাকা তুমি নেবে না। কোম্পানীর [illegible]ওয়া চাকরী তুমি নিলে না। তার অর্থ আমি না হয় বুঝি। কিন্তু এই অসহায় অবস্থায় নিজের দিদির কাছে যেতেও কেন যে তোমার আপত্তি সেইটেই শুধু বুঝি না।

সেইটেই শুধু বুঝতে পার না, না? সমীরের ঠোঁটে ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি। দেখ মলি, এ যদি শুধু আমার কথা হত তাহলে দিদির কাছে যেতে আমার কোন বাধাই ছিল না। কিন্তু আমার সঙ্গে যে তুমি জড়িয়ে আছ।

এ-কথা কেন বলছ? তুমি যেখানে যেতে পার আমার কি সেখানে ঠাঁই হবে না? তোমার দিদি কি আমার দিদি নয়?

সমীরের গলায় বিদ্রূপটা এবার ধারালো হয়ে উঠল, তাই হতো, যদি দিদির মর্যাদায় তাঁকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে আমরা পারতাম।

সুদিনে যাকে হেলাভরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম আজ দুর্দিনে ভিখারীর মত তাঁরই বাড়িতে যেয়ে দাঁড়াব কোন্ মুখে ?

এই কঠোর অভিযোগের মুখে খানিক ক্ষণ চুপ করে রইল মলি। তারপর ধীরে ধীরে বলল, তোমার কাছ থেকে এ আঘাত আমার পাওনা। তাই মুখ বুজেই তাকে আমি মেনে নিলাম। কিন্তু একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না সমীর। ছোটবেলা থেকে যে ভাবে চলতে বলতে আমি অভ্যস্ত তা থেকে আমাকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা তো তোমরা কেউ কোন দিন কর নি। অথচ খেয়ালের মাথায় রাগের ঝোঁকে যে অন্যায় একদিন আমি করে ফেলেছি সারাটা জীবন তার জন্য সবাই মিলে আমাকে আর কত হেনস্তা তোমরা করবে ? সে অপরাধের জন্য তোমাদের সকলের কাছে বার বার কি আমি ক্ষমা চাই নি ? তবু আমার সেই একদিনের অপরাধই বড় হল ? সে জন্যে স্বয়ং ভগবান যে আমাকে এত বড় শাস্তি দিলেন, তাতেও কি আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না ?

কথাগুলো আস্তে আস্তে বললেও শেষের দিকে অবরুদ্ধ কান্নায় তার গলা ধরে আসছিল। চোখের কোণে দুফোঁটা অবারণ অশ্রুও টলমল করছিল।

শুনতে শুনতে সমীর বিছানায় উঠে বসেছিল। স্তব্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়েছিল মলির ব্যথাম্লান উত্তেজনায় রাঙা মুখখানার দিকে। তার কথা শেষ হতেই সে বলে উঠল, মলি, এ সব তুমি কী বলছ ?

কেন ? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? ভাবছ কথাগুলো বানিয়ে বানিয়ে বলছি ?

না না, তা নয়, তোমার সব কথাই আমি বিশ্বাস করি। আর যে দোষই তোমার থাক, কোন কিছু লুকিয়ে-ছাপিয়ে যে তুমি বলতে পার না সে আমি জানি। আমি শুধু ভাবছি আজকের মলি আর সে দিনের মলি কি একই মলি।

উচ্ছ্বসিত গলায় মলি বলল, এক এক এক। তুমি কেন বুঝতে পার না যে মানুষই ভুল করে, আবার সেই মানুষই একদিন সে ভুলের উর্দ্ধে উঠতে পারে।

সাগ্রহে সমীর বলল, পারবে তুমি, সত্যি সে ভুলের উর্দ্ধে তুমি উঠতে পারবে মলি?

পারব গো পারব, তুমি দেখে নিও।

হ্যাঁ, দেখেই সমীর নেবে। চুপ করে ভাবতে ভাবতে এই সংকল্পই দৃঢ় হয়ে উঠল সমীরের মনে। তার দুর্ঘটনার পর থেকেই মলি যে একান্ত আকস্মিক ভাবেই বদলে গেছে, তার প্রতিটি চাল-চলনে, কথা-বার্তায়, সেবা-মমতায় সে সত্য সমীরের মনেও অনেক দিনই ছায়া ফেলেছে। তবু সব দেখেশুনেও এতদিন যেন মলিকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে নি সে। কিন্তু তার সেদিনকার বক্তব্যের দৃঢ়তা ও গভীরতা সমীরের মনেও এনে দিল দৃঢ় প্রত্যয়।

মুখ তুলে সমীর বলল, তাহলে তোমার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে মলি।

ভীত কণ্ঠে মলি বলল, কি প্রস্তাব বল।

চল এ-শহরের বাস ছেড়ে আমরা চলে যাই।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মলি। বলল, আমিও তো সেই কথাই বলতে এসেছি তোমাকে। তাহলে দিদিকে চিঠি লিখে দি?

না, দিদিকে কিছু লিখতে হবে না।

তাহলে? আশংকায় জড়িয়ে গেল মলির গলা।

শহরের বাস তুলে দিয়ে আমরা চলে যাব আমাদের গ্রামের বাড়িতে। ছোট একখানা ঘর বেঁধে সেখানে বাস করব। যে টাকা এখনও আমার আছে তাতে সারা জীবন না হোক পাড়াগাঁয় অনাড়ম্বর জীবন বেশ কিছুদিন চলে যাবে। তাছাড়া বাড়ির পাশে ছোট একটা ফলমূলের বাগান করব আমরা। ধানের জমি কিনব সারা বছরের খোরাকের মত। দরকার হলে ছোট একটা পাঠশালা খুলব।

তিনটে মানুষের তাতে খেয়ে পরে বেশ ভাল ভাবেই চলে যাবে। কি বল ?

নিজের আবেগেই এতক্ষণ কথা বলে যাচ্ছিল সমীর। এবার মুখ তুলে দেখল, মলি অবাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে।

হেসে সমীর বলল, কি, পারবে না শহর থেকে দূরে সেই গাঁয়ে গিয়ে থাকতে ?

মলি মাথা নিচু করে দৃঢ় স্বরে বলল, পারব।

তাহলে তুমি রাজী ?

রাজী।

কিন্তু একটা শর্ত আছে।

কি ?

আমাদের এই নতুন ঘরের খবর তুমি কাউকে জানাতে পারবে না। তোমার বাবাকেও নয়, আমার দিদিকেও নয়। এ ঘর শুধু আমাদেরই ঘর।

বেশ, তাই হবে।

তার কয়েকদিন পরেই সপরিবারে অজ্ঞাতবাস করেছিল সমীর।

ছোট গ্রাম। মাঝখান দিয়ে মাটির রাস্তা গেছে এঁকে বেঁকে। চারদিকে ঝোপ-জঙ্গল। কোথাও বা ঘন বন। পথের পাশে পানা-পুকুর। খড়ের ছাউনি দেওয়া কালী-মন্দির। কোথাও বা ছোট মুদিখানার দোকান। তার রকে পল্লীর অলস কর্মহীনদের সারা দিন-রাতের আড্ডা।

সমীরদের পৈত্রিক বাড়ি অশ্রুর বিয়ের সময় বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তাবলে আশ্রয়ের তাদের অভাব হল না। স্বর্গত মাস্টার মশায়কে সবাই ভালবাসত, ভক্তি করত। তাঁরই ছেলে এত বড় কৃতবিদ্য মানুষটি দুর্বিপাকে পরে দেশ-গাঁয়ে ফিরে এসেছে। দশজনে মিলে খেটেখুটে ওদের ঘরদোর তৈরী করে দিল।

সমীরের বাবার বন্ধু চরণ মণ্ডল তো একেবারে জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করল দিনরাত। ভরসা দিয়ে বলল, তুমি কিচ্ছুটি ভেবনি বাবু-মশাই, আমরা সবাই তো রয়েছি।

কাঁচা বাড়ি। খড়ের ঘর। মাটির দাওয়া। সামনে ছোট একটুখানি সবজি বাগান। নিজে হাতেই ওরা নানান গাছগাছালি লাগিয়েছে তাতে। সবুজ সতেজ গাছগুলি মৃদু বাতাসে ঈষৎ দুলতে থাকে। তা দেখে পামেলা হাত তালি দিয়ে নাচে। হঠাৎ লাগা খুশিতে ডগমগ হয়ে সমীর আর মলি গভীর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে সেদিকে চেয়ে থাকে। মনে ভাবে : ওরাই তো এই নতুন সৃষ্টির বিধাতা।

বাড়ির সামনে কাঁচা রাস্তা পার হলেই দিগন্তবিস্তার মাঠ। প্রায়ই বিকেলে তিনজন সেখানে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর চলে যায়। মাঠের পথে পা ফেলতে ফেলতে অলস কল্পনা-বিলাস সমীরের মনকে একেবারে যেন পেয়ে বসে : এই ধূলোতেই ও প্রথম পেয়েছিল ধরনীর আলোর পরশ। এরই কোলে কেটেছে ওর শৈশব ও কৈশোর। এই মাটি ওর স্বর্গ। এর সঙ্গে ওর নাড়ির যোগ। এই ঘরই ওর আপন ঘর।

কখনও বা ভাবে : জীবন এখানে ছোট, সংকীর্ণ, সংক্ষিপ্ত। কিন্তু জীবনের পটভূমি এখানে অনেক অনেক বড়। পল্লীর ভোরের আকাশ মাঠের শান্ত সবুজের উপর দিয়ে বাতাসের খেলা, পল্লীর মেটে পথ, ছোট বন, পানা পুকুর, সন্ধ্যার সোনাগলা নদী, রাতের তারায় ঘেরা আকাশ, ভোরের শুকতারা—এ যে একবার দেখেছে দুচোখ ভরে, সেই তো ধন্য হয়েছে, কৃতকৃতার্থ হয়েছে।

যন্ত্রপূজারী সমীরের মন এ-সত্যকে বার বার স্বীকার করে।

নিজের ভাবনার মধ্যেই সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছিল সমীর। চমক ভাঙল মলির মৃদু হাসির শব্দে।

মলি বলল, বাবাঃ! কী এমন ধ্যান করছিলে যে আমার আসাটাও টের পাও নি?

মুখ ফিরিয়ে সমীর দেখল, একটা ছোট বাটি হাতে নিয়ে মলি দাঁড়িয়ে মিস্টি মিস্টি হাসছে।

হেসে জবাব দিল, ধ্যানই করছিলাম—তোমাকে।

নাও হয়েছে, এখন এই তুধটুকু খেয়ে নাও তো।

তুধের বাটিটা হাতে নিয়ে মুখে তুলতে যেয়েও হঠাৎ থেমে গেল সমীর। প্রশ্ন করল, মেলি খেয়েছে তুধ?

না। মলির গলাটা যেন একটু কেঁপে উঠল।

কেন?

কোন জবাব দিল না মলি। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তার মানে, সবটা তুধই আমার জন্যে বরাদ্দ করে রেখেছ। কিন্তু কেন—কেন এমন নিষ্ঠুর স্বার্থপর আমাকে ভেবেছ তোমরা?

না না, তা কেন। তুধ খাওয়া তোমার দরকার, তাই—

আর ওই তুধের মেয়েটার বুঝি তুধের দরকার নেই? তা নয় মলি, আসল কথা হল, তোমরা মা ও মেয়েতে মিলে অনাহারে অর্ধাহারে কাটিয়ে আমাকে দিয়ে বসে বসে রাজভোগ গেলাবে আর বাহাতুরি নেবে।

জবাবে মলির গলাও এবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, রাজভোগ যে তোমাকে কত খাওয়াচ্ছি সে আমিও জানি তুমিও জান। এ শুধু আমাকে খোটা দেওয়া। এই রইল তুধের বাটি। ইচ্ছে হয় খেয়ো না হয় মাটিতে ঢেলে ফেলে দিও।

সমীরের কোন কথার জন্য অপেক্ষা না করেই মলি বাড়ির ভিতর চলে গেল। তুধের বাটিটার দিকে চেয়ে সমীর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। নিজের সমাজ সংস্কার শিক্ষা দীক্ষা সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র তাকেই আশ্রয় করে যে মেয়েটি অহরহ অপরিসীম কষ্ট ও তুর্দশার ভিতর দিয়ে হাসিমুখে দিনাতিপাত করছে তারই প্রতি নিজের এই অকারণ

তিক্ত ব্যবহারের জন্য সমীরের মনে যেন অনুশোচনার আর অন্ত রইল না।

এমনি ছোটখাট মান অভিমান হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়েই সমীর আর মলির জীবন এগিয়ে চলল স্বচ্ছ সহজ গ্রাম্য নদীটির মত। মহাসাগরের স্বপ্ন তার চোখে নেই। বুকে নেই পার্বত্য খরস্রোতার আকুল তরঙ্গাবেগ। শান্ত সহজ নিরুদ্বেগ।

তবু সমীরের এই ছোট নীড়েও ঝড়ের হাওয়া লাগল।

পৌষের প্রথম শীতে অসুস্থ হয়ে পড়ল পামেলা। প্রথমে সামান্য সর্দিজ্বর। একধারে অ্যালোপ্যাথ-হোমিওপ্যাথ-কবরেজ হারান ডাক্তারের চিকিৎসার ব্যবস্থাও হল। কিন্তু একে একে সাত-দিন কেটে গেল জ্বর ছাড়ল না। হারান ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বললেন, রোগটা মেয়াদীও হতে পারে। চোদ্দ দিনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া তো গতি দেখি না।

থর থর করে কেঁপে উঠল মলির বুক। সমীরকে জানাল সব। বলল, সাতদিন একজ্বরে কেটে গেল আর তো বসে থাকা যায় না।

কি করতে চাও?

শহর থেকে একজন বড় ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করা দরকার।

বড় ডাক্তার বড় মানুষের জন্য। সে বড় মানুষ আমি নই।

কিন্তু রোগ তো ছোট-বড় মানে না।

তা জানি। আবার হারান ডাক্তারের চিকিৎসায়ই এখানকার লোকরা তো বেঁচেও আছে।

তাই বলে বড় ডাক্তার তুমি ডাকবে না?

টাকা তো তোমার হাতেই থাকে। ইচ্ছে করলেই ডাকতে পার।

তাই ডাকব।

শহর থেকে বড় ডাক্তার এলেন। মোটা ভিজিট নিলেন। ততোধিক মোটা প্রেসক্রিপশন লিখলেন। রোগীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবার পরামর্শ দিয়ে গাড়িতে চড়লেন।

কিন্তু মুস্কিল হল, সে প্রেস্‌ক্রিপশনের ওষুধ আর ইনজেকশন হারান ডাক্তারের ঔষধালয়-ফার্মেসীতে পাওয়া গেল না। অগত্যা একজন লোককে ডাক্তারবাবুর গাড়িতেই শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

যথাসাধ্য সবই করল মলি। একা মলি। সমীর যেমন বারান্দায় মোড়া পেতে বসে থাকত তেমনি নির্বিকার ভাবেই বসে রইল। না একটা হাত নাড়ল, না মুখে একটা কথা বলল।

রোগ তবু হ্রাসের দিকে গেল না। হারান ডাক্তার যথারীতি আসেন যান। কিন্তু ভরসার কথা কিছু শোনাতে পারেন না।

একা একা বড়ই অসহায় বড়ই বিপন্ন বোধ করতে লাগল মলি।

অনেক ভাবল। কোনই কিনারা করতে পারল না। সমীরের কাছে কথা পাড়ল। বিশেষ কোন সাড়া পেল না।

একান্ত নিরুপায় হয়েই একদিন অজ্ঞাতবাসের শত ভঙ্গ করল মলি। সব কথা খোলাখুলি জানিয়ে চিঠি লিখল অশ্রুকে।

ফেরং ডাকেই তিমিরের চিঠি এল সমীরের নামে। তিমির লিখেছে, মলির চিঠিতে সবই সে জেনেছে। এই বিপদে তারা যেন সব মান-অভিমান ত্যাগ করে তিমিরের ওখানে যাওয়া স্থির করে। গ্রামেই একটা ছোটখাট আধুনিক হাসপাতাল করেছে সে। সেখানেই মেলির সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হতে পারবে। অতএব কাল বিলম্ব নয়। সমীরের চিঠি পেলেই তাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা সে করবে।

চিঠিখানি পড়ে খানিক গুম হয়ে বসে রইল সমীর। তারপর গম্ভীর গলায় ডাকল, মলি।

চিঠি এসেছে জেনেই মলি দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করল, কে লিখেছে চিঠি? দিদি?

না, তিমিরদা। দিদিকে তুমি চিঠি লিখেছ কৈ তা তো আমাকে বল নি?

বললে তুমি হয় তো চিঠি লিখতে দিতে না, তাই—

হুঁ। কিন্তু এখানে আসবার আগে তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে—

হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল মলি। সমীরের কথার মাঝখানেই বলে উঠল, ঠুনকো একটা মুখের কথার চেয়ে মেলির জীবনের দাম অনেক বেশী। কিন্তু কি লিখেছেন দাদা? আমাদের যেতে লিখেছেন তো?

হ্যাঁ। রথ-চৌদল পাঠিয়ে দেবেন তাও জানিয়েছেন। সমীরের গলাও ব্যঙ্গে ধারাল হয়ে উঠল।

পাল্টা জবাব দিল মলি, এতেও তোমার রাগ হল? তুমি কি মানুষ না পাথর?

না, আমি মানুষ নই। রাগে ফেটে পড়ল সমীর। মানুষই যদি হব তাহলে এমন অক্ষম পরাশ্রিত হয়ে বেঁচে থাকব কেন? তুমি ঠিকই ধরেছ মলি, আমি মানুষ নই পাথর। নইলে সুখে থাকার এত পথ খোলা থাকতেও এত দুঃখের মধ্যে তোমাদের টেনে নিয়ে আসব কেন? একমাত্র মেয়ের এমন গুরুতর অসুখেও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব কেন? তুমি ঠিকই করেছ। আজই চিঠি লিখে দাও, আমরা রাজী আছি। যত তাড়াতাড়ি হয় তারা যেন আমাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে।

তীব্র আঘাতের পর হঠাৎ এই আশ্বাসের বাণী শুনে মলির বুকখানা আনন্দে যেন নেচে উঠল। উৎসাহে উত্তেজনায় কাঁপা গলায় সে বলল, তুমি বলছ, তুমি রাজী! আঃ! তুমি আমাকে বাঁচালে। আমি তো ভেবেছিলাম, শেষ মুহূর্তে বুঝি তুমি বেঁকে বসবে। যা জিদ তোমার, বাবাঃ!

বাঁকা হেসে সমীর বলল, না না, বাঁকা পথে নয়, তুমি দেখে নিও এবার থেকে আমি ঠিক সোজা পথেই চলব।

চোখে-মুখে খুশির আবির ছড়িয়ে মলি ভিতরে চলে গেল। কিন্তু যদি সে মুখ ফিরিয়ে একটু ভাল করে লক্ষ্য করত তাহলে দেখতে পেত, কিসের একটা দুর্বিসহ যন্ত্রণায় সমীরের সারা মুখটা একেবারে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

বাইশ।

একখানি চিঠি।

প্রিয় তিমিরদা, আঁধার রাতে যাঁকে পেয়েছিলাম তাকে হারিয়েছিলাম আর এক আঁধার রাতেই। তাকে ভুলও হয় তো বুঝেছিলাম। তবু মনের ঘরে তার স্মৃতির আরতি আজও চিরউজ্জ্বল।

তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার ওখানে যাবার জন্য আমরা সবাই তৈরী, সে-কথা মলির চিঠিতেই জেনেছ। তিমিরদা, এ সংসারের কাছে আমি একেবারেই অনাবশ্যক। একটা অপ্রয়োজন বোঝামাত্র। তোমরা দুজন ছাড়া এ বোঝা নামাবার ঠাঁই আর আমাদের কোথায় আছে বল?

তবু যাওয়া আমার হল না তিমিরদা। আর সেই জন্যেই এই চিঠি লিখতে বসেছি। তুমি হয় তো বিরক্ত হয়ে ভাবছ এ আবার কি হেঁয়ালি শুরু করলাম। হেঁয়ালি নয়। তাহলে শোন।

আমাদের বাড়ির পাশেই বাস করে এক কামার তার পরিবার নিয়ে। দিনরাত তার ঘরে হাপরের শব্দ আর হাতুড়ির আর্তনাদ। আমার ঘরে বসে বসেই শুনি তার হাতুড়ির আঘাত। যত শুনি বুকের রক্ত আমার চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেন নাচতে থাকে তার তালে

তালে। মাঝে মাঝে কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠি। ক্রাচে ভর দিয়েই ঘরময় পায়চারি করে বেড়াই।

কাল রাতে কি ঘটেছিল জান?

তখন অনেক রাত। মেলির অবস্থা একটু ভাল। তাই একটু সকাল-সকালই আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিসের যেন শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। দীপহীন ঘর। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানায়। কানে এসে বাজতে লাগল কামারের হাতুড়ির শব্দ। মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তারপর কিছুই জানি না আমি। কখন যেন নিজের অজ্ঞাতেই বিছানা ছেড়ে নেমে গিয়েছিলাম বাড়ির সামনের ছোট সব্জি বাগানে। হাতে তুলে নিয়েছিলাম কোদাল। হাতুড়ির তালে তালে কোদাল চালিয়ে মাটি কোপাচ্ছিলাম বাগানের। কিছুই খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল মলির চীৎকারে।

বারান্দা থেকেই চীৎকার করে আমাকে ডাকল মলি। বলল, এ কী করছ তুমি?

এতক্ষণে যেন আচ্ছন্ন মনের মাটিতে প্রথম অরুণালোক এসে পড়ল। বললাম, তাই তো মলি, এ আমি কি করছি?

এগিয়ে এসে মলি আমার হাত ধরল। বলল, ঘরে এস। তুমি কি ভুলে গেছ যে ডাক্তার তোমাকে সব রকম পরিশ্রমের কাজ করতে একেবারে বারণ করেছেন।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলাম মলির মুখের দিকে। মনে মনে বুঝলাম, আমার অবচেতন মনের তীব্র কর্মপ্রেরণায় নিজের অজ্ঞাতেই ঘুমের ঘোরে আমি নেমেছিলাম নিশীথ রাতের কাজের পথে। কিন্তু হায়রে! কাজ করা যে আমার বারণ। বেঁচে থাকতে কাজ করা আর আমার চলবে না। তোমাকে কি বলব তিমিরদা, দুই চোখ আমার সহসা জলে ভরে এল। ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠল বুকটা। বুঝি বা নিজের হাতেই এমনি করে একদিন নিজের কবর আমি

খুঁড়ব। কাজ ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। অথচ কাজ করলেও আমি বাঁচব না। এ কি সংকট বল তো? পৃথিবী কর্মময়। সবাই যার যার কাজের চাকায় ঘুরছে ঘুরবে। আর আমিই বসে থাকব কর্মহীন জড় স্থবির! না না, তিমিরদা, তা হয় না, তা হবে না। তোমাদের এ কাজের জগৎ থেকে আমি তাই সরে যাচ্ছি। দূরে, অনেক দূরে। কত দূরে তা আমি জানি না। তোমরাও জানতে চেয়ো না। তোমার গ্রামে তুমি নতুন করে কাজ শুরু করেছ। ট্র্যাক্টর আনিয়েছ। আনিয়েছ আধুনিক সব যন্ত্রপাতি। তাই নিয়ে চাষাবাদে কাটবে তোমার কাজের দিন। তার উপর আছে তোমার স্কুল। তোমার হাসপাতাল। আছে আরও হরেক রকম কাজ। তোমাদেরই ওই কাজের ঘূর্ণিতে আমি যে তলিয়ে যাব তিমিরদা।

কিন্তু তলিয়ে যেতে আমি চাই না। আমি চাই বাঁচতে। নতুন করে বাঁচতে। আর সেই বাঁচার তাগিদেই চললাম হিমালয়ের ডাকে। বারে বারে আজ বাবার কথাই মনে পড়ছে। তাঁর মুখেই প্রতি প্রভাতে শুনেছি আলোর স্তবগান: তমসো মা জ্যোতির্গময়! আলোর আনন্দলোকে মানুষের পথ কোন দিন পৌঁছিবে কি না জানি না। হয় তো পথ তার পথেই হারিয়ে যাবে। হয় তো বা মানুষের এগিয়ে চলার পথে এক সুন্দর প্রভাতে একখানি কল্যাণময় হাত নেমে আসবে উপর থেকে। মানুষের হাত মিলবে সে হাতে। আলোর ভগবান নেমে আসবে না আঁধার ধরণীতে। মানুষের হাতকেই উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে হবে আলোময়ের নন্দনলোকে। ভগবান মানুষ হবে না কোন দিন। অবতারবাদে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, মানুষকেই অগ্রগতির পথ বেয়ে হতে হবে ভগবান।

লিখতে লিখতেই কানে বাজছে ভোরের পাখির ডাক। খুলে দিলাম ঘরের জানালা। আঁধার পৃথিবীতে আলোর আগমনী যেন আজ নতুন সুরে বাজছে আমার কানে: তমসো মা জ্যোতির্গময়!

মলি ও মেলি রইল। আর রইলে তোমরা। পিছনের টান আমার খুলে গেল জীর্ণ খোলসের মত।

কিন্তু আর দেরী নয়। রাতের আঁধার থাকতে থাকতেই আমি পথে নামব। পথেই কোথাও চিঠিটা ডাকে দেব। তারপর শুধু চলা—এগিয়ে চলা।

আমার শেষ প্রণাম গ্রহণ কর।

—পথিক সমীর